পেনসিল আর সর্বকর্মার অ্যাডভেঞ্চার

ইউরি দ্রুজকভ

পেনসিল আর সর্বকর্মার অ্যাডভেঞ্চার

সত্যমূলক রূপকথা

প্রগতি প্রকাশন • মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

ছবি এ'কেছেন নিকোলাই গ্রিশিন

আদরের ছোটো বন্ধুরা!

আমাদের দুই নায়ক — যাদুকর পটুয়া, ড্রয়িঙের মাস্টার পেন্সিল আর সব কাজের কাজী, লোহার মানুষ সর্বকর্মা তাদের বৃত্তান্ত, তাদের নানা অ্যাডভেঞ্চার, তাদের যাদু ইশকুলের খবর শোনাবার জন্যে এবার বিদেশ যাত্রা করল।

বইটি পড়ার পর তোমাদের অনেকেই নিশ্চয় ধরতে পারবে যে যাদুর ইশকুলটা খাস জীবন ছাড়া আর কিছুই নয়। সে জীবন কিছু শিখিয়েছে, সবই শেখাবে। তোমরা কি চিঠি লিখে জানাবে বইটা থেকে তোমরা কী বুঝলে, কী শিক্ষা পেলে?

নানান জায়গা থেকে ছেলেমেয়েদের চিঠি আমরা পাই অনেক। যাদু ইশকুলের ঠিকানাটা জানতে চায় সবাই। একটি ছেলে লিখেছে: 'যাদু ইশকুলের ঠিকানাটা আমায় দিন, নিজের জন্যে একটা বাইসাইকেল, টোটা সমেত বন্দুক আর দুটি দম-দেওয়া খেলনা মোটরগাড়ি আঁকতে চাই।'

আরেকজনের ইচ্ছে একটু অন্য রকম: 'যাদু ইশকুলে ভর্তি হতে চাই, আমাদের গাঁয়ের জন্যে ঠিক অমনি একটা ইশকুল এ'কে দেব, ফলে সব ছেলেমেয়েই তাতে পড়তে পারবে। তাছাড়া বাড়ির কাছে একটা নদী আঁকতে চাই, ঠাকুমাকে তাহলে বেশি দূর হাঁটতে হবে না, বুড়ো হয়ে গেছেন তো...'

দেখেছ তো, কত রকমের ছেলে আছে, কত রকম তাদের চিঠি। আমাদের ইচ্ছে কী জানো, তোমরা ওই দ্বিতীয় ছেলেটির মতো হও। কেন, সেটা নিজেরাই ভেবে দ্যাখো।

ইউরি দ্রুজকভ

Ю. Дружков

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАРАНДАША И САМОДЕЛКИНА

На языке бенгали

অধ্যায় এক

শশায় চেপে ওড়া

মস্তো এক শহরের ভারি সুন্দর এক রাস্তা, নাম তার ঠুন-ঠুন ঘণ্টি। সে রাস্তায় ইয়া বড়ো এক খেলনার দোকান।

একদিন কে যেন হাঁচল দোকানটায়।

ছেলেদের যে খেলনা দেখাচ্ছে সেই দোকানী মেয়েটি যদি হাঁচত তাতে অবাক হবার কিছু থাকত না। কিংবা যদি হাঁচত কোনো বাচ্চা খরিদ্দার, তাতেও তাজ্জব কিছু নেই। কিন্তু দোকানী মেয়ে বা বাচ্চা খরিদ্দার নয়, হে'চেছিল একটা খেলনা। আমায় কেউ বিশ্বাস করবে না, তাহলেও ব্যাপারটা বলি।

হাঁচল একটা বাক্স! আরে হ্যাঁ, রঙীন পেন্সিল যে ধরনের বাক্সে থাকে। ছোটো বড়ো নানান বাক্সের মধ্যেই ছিল ওটা। তার ওপর জবলজবলে হরফে ছাপানো ছিল:

'ক্ষুদে যাদুকর' রঙীন পেন্সিল

পাশেই ছিল আরেকটা বাক্স। নাম তার:

'ওস্তাদ সর্বকর্মা' মেকানো

প্রথম বাক্সটা হে'চে উঠতেই অন্য বাক্সটা বললে:

'জীব! জীব!'

প্রথম বাক্সটার রঙচঙে ডালাটা তখন একটু উ'চু হয়ে উঠল, তারপর একেবারেই খুলে গেল, বেরিয়ে এল একমাত্তর একটি পেন্সিল। কিন্তু কী সে পেন্সিল! সাধারণ নয়, রঙীনও নয়, আশ্চর্য এক অসাধারণ পেন্সিল।

তার চেহারা দেখে হাসি পাচ্ছে, তাই না?

পেন্সিল মেকানোর কাছে গিয়ে তার কাঠের ডালায় টোকা দিলে। জিজ্ঞেস করলে:

'কে তুই?'

'আরে আমি, ওস্তাদ সর্বকর্মা,' জবাব শোনা গেল ভেতর থেকে, 'আমায় একটু বের করে আন-না। নিজে নিজে পারছি না কিছুতেই!..' খট-খট ঝন-ঝন শব্দ হল ভেতরে।
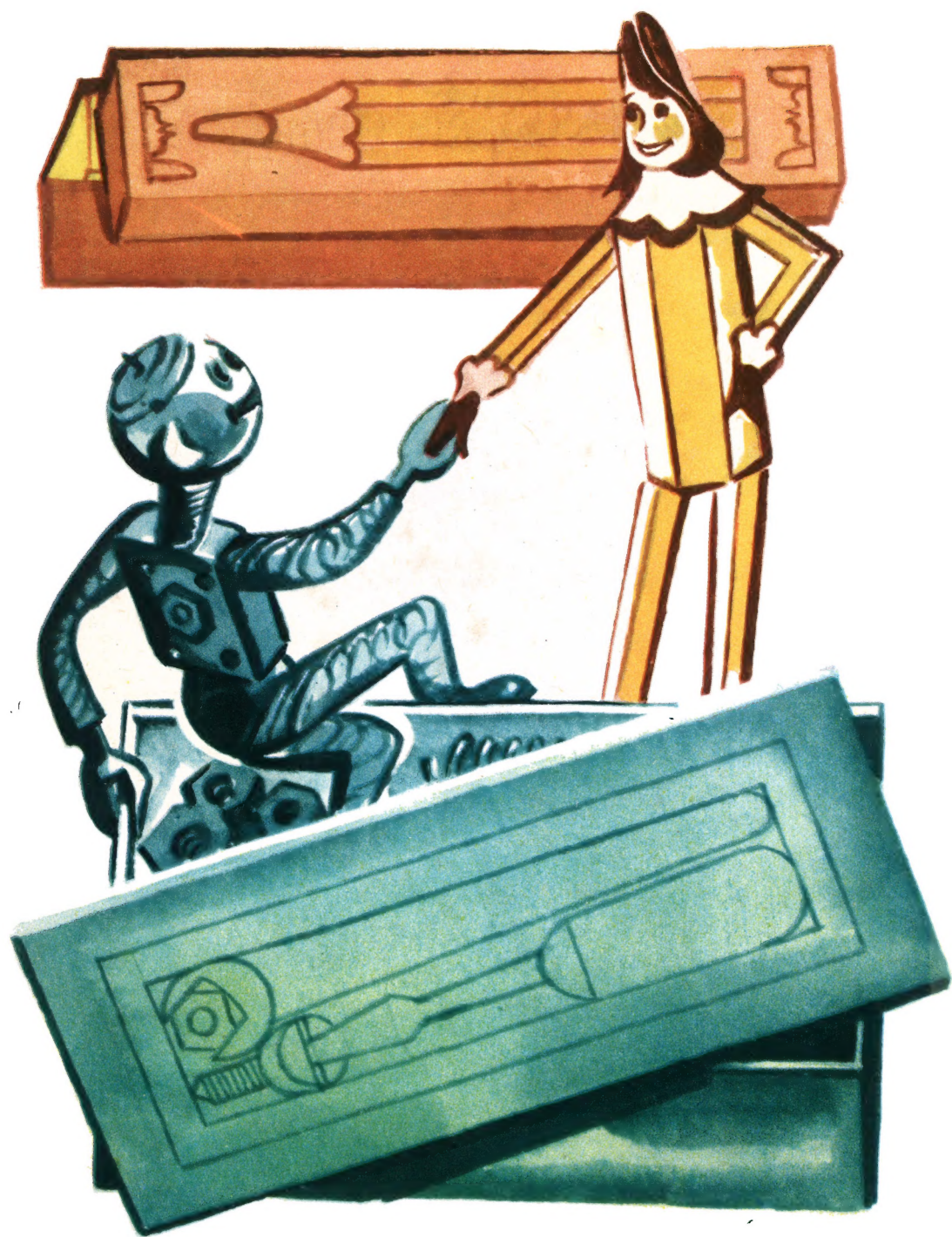
পেন্সিল তখন ডালাটা টেনে খুলে উ'কি দিলে ভেতরে। দেখে, নানা ধরনের চকমকে ইস্ক্রুপ, বল্টু, পাত, স্প্রীঙ, চাকতির মধ্যে বসে আছে লোহার এক ক্ষুদে মানুষ। স্প্রীঙের মতো সে লাফিয়ে উঠল বাক্সটা থেকে, নড়বড় করতে লাগল স্প্রীঙে বানানো সরু সরু মজাদার পায়ের ওপর, তাকিয়ে দেখতে লাগল পেন্সিলকে।

'তুই আবার কে?' জিজ্ঞেস করলে অবাক হয়ে।

'আমি? আমি হলাম গে যাদুকর পটুয়া। নাম আমার পেন্সিল। জীবন্ত ছবি আঁকতে পারি আমি।'

'জীবন্ত ছবি, সে আবার কী?'

'মানে ধর, একটা পাখি এ'কে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই তা জীবন্ত হয়ে উড়ে যাবে। কিংবা চকোলেট এ'কে দেব। খাওয়া চলবে তা।'

'বাজে কথা!' বললে সর্বকর্মা, 'তাই আবার হয়!' হেসে উঠল, 'একেবারে গাঁজাখুরি।'

'যাদুকররা কখনো মিথ্যে বলে না,' রেগে উঠল পেন্সিল।

'বেশ, তাহলে আঁক তো দেখি এরোপ্লেন। দেখা যাবে কেমন তুই সত্যবাদী যাদুকর।'

'এরোপ্লেন? সেটা কী জিনিস আমি তো জানি না,' কবুল করলে পেন্সিল, 'তার চেয়ে বরং একটা গাজর এ'কে দিই, কেমন?'

'গাজরে আমার দরকার নেই! কিন্তু সত্যিই কখনো তুই এরোপ্লেন দেখিস নি নাকি? হাসিয়ে মারলি!'

আবার খানিকটা আহত বোধ করলে পেন্সিল।

'হাসি থামা তো। সবই যদি তোর দেখা, তাহলে বুঝিয়ে বল এরোপ্লেন কেমন হয়, কী রকম দেখতে। সেই ভাবে এ'কে দেব। বাক্সে আমার একটা অ্যালবাম আছে। রাঙাবার জন্যে নানা রকম ছবি আঁকা আছে তাতে। পাখি, গাজর, শশা, চকোলেট, ঘোড়া, মোরগছানা, মুরগী, বেড়াল, কুকুর — এই সব। এরোপ্লেন-টেরোপ্লেন কিছু তাতে নেই।'

স্প্রীঙ ঝনঝনিয়ে লাফিয়ে উঠল সর্বকর্মা:

'ইস, কী সব বাজে ছবি তোর বইটাতে। যাক গে, এরোপ্লেন কেমন তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ওটা হল ডানাওয়ালা এক মস্তো লম্বা শশার মতো। দাঁড়া, মেকানো থেকে এরোপ্লেনের একটা মডেল বানিয়ে দিই।'

বলেই বাক্সে লাফিয়ে ঢুকল সর্বকর্মা।

ঝনঝন করলে সে লোহার পাতগুলো নিয়ে, খোঁজাখুঁজি করলে লাগসই ইস্ক্রুপ বল্টু, ঢোকালে যেখানে যা দরকার, প্যাঁচ দিলে স্ক্রু-ড্রাইভারে, ঠুক-ঠুক করলে হাতুড়ি আর কেবলি গুণগুণ করে গাইলে:

সবই বানাই নিজে নিজে,
বিশ্বাস নেই আজব চীজে!
নিজে নিজে! সবই নিজে!

পেনসিল ওদিকে পকেট থেকে বার করলে যত রঙীন পেনসিল, ভেবে ভেবে এঁকে দিল এক শশা, — তাজা, সবুজ, বুটিদার গা। তারপর ডানা এঁকে দিলে তার সঙ্গে। হাঁক দিলে:

'কইরে সর্বকর্মা, আয় এখানে, এরোপ্লেন এঁকে দিয়েছি।'

'এক মিনিট,' সাড়া দিলে ওস্তাদ, 'আমার শুধু এই প্রপেলারটা বাকি, তাহলেই এরোপ্লেন তৈরি। ইস্ক্রুপ নিয়ে প্রপেলারটায় এই ঢুকিয়ে দিলাম, শুধু গোটা দুয়েক বাড়ি। বাস্... এই দ্যাখ, এরোপ্লেন কেমন হয়।'

বাক্স থেকে লাফিয়ে এল সর্বকর্মা, হাতে তার এরোপ্লেন। ঠিক যেন একেবারে আসল এরোপ্লেন! তার বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই, কেননা সব ছেলেমেয়েই এরোপ্লেন দেখেছে। দেখে নি শুধু পেনসিল। সে বললে:

'বা, কী সুন্দর তুই এঁকেছিস।'

'তুই একটা কীরে!' হাসল ওস্তাদ, 'আঁকতে আমি জানিই না। এরোপ্লেন বানালাম মেকানো থেকে।'

এই সময় তাজা সবুজ শশাটা চোখে পড়ল তার। অবাক হয়ে গেল সে:

'শশাটা পেলি কোথায়?'

'এটা... এটা হল আমার এরোপ্লেন...'

ওস্তাদ সর্বকর্মা তার সবগুলো স্প্রীঙ নাচিয়ে, ঝনঝনিয়ে হেসে উঠল হো-হো করে।

দেখলে তো, সর্বকর্মা কেমন রগুড়ে, হাসছে তো হাসছেই, যেন সুড়সুড়ি দিচ্ছে কেউ, হাসি আর তার থামে না।

ভারি রাগ হয়ে গেল পেনসিলের। তক্ষুনি সে মেঘ এঁকে দিলে দেয়ালে। অমনি সত্যিকারের বৃষ্টি পড়তে লাগল সে মেঘ থেকে। আপাদমস্তক ভিজে যেতে হাসি থামালে সর্বকর্মা। বললে:

'বর-র-র... বিচ্ছিরি এই বৃষ্টিটা এল কোত্থেকে? জং ধরে যাব যে!'

'কিন্তু হাসছিলি কেন তুই?' চ্যাঁচালে পেনসিল, 'নিজেই তো তুই শশার কথা বলেছিলি।'

'ওই মাগো! আর হাসাস নে বাপু, আমার ইস্ক্রুপগুলো খুলে আসছে। এরোপ্লেন বটে! শশার মধ্যে আবার মুরগীর পালক গোঁজা! ও এরোপ্লেন কখনো উড়বে না।'

'আলবৎ উড়বে। ডানাও মেলবে, এরোপ্লেনও উড়বে।'

'কিন্তু তোর ইঞ্জিন কই এরোপ্লেনে? রাডার কোথায়? ইঞ্জিন, রাডার ছাড়া এরোপ্লেন ওড়ে না।'

'বেশ, বস আমার এরোপ্লেনের ওপর। দেখাচ্ছি ওড়ে কি না,' বলে শশায় চেপে বসল পেনসিল।

সর্বকর্মাও হাসিতে লুটিয়ে পড়ল ঠিক শশাটার ওপরেই। এই সময় খোলা জানলা দিয়ে হাওয়া বইল এক ঝলক, হঠাৎ ঝটপট করে উঠল ডানা, শশাটা কেঁপে উঠে উড়ে গেল সত্যিকারের এরোপ্লেনের মতো।

'আরে!' একসঙ্গেই চেঁচিয়ে উঠল পেনসিল আর সর্বকর্মা।

'দম, দরাম!'

তাজা শশা, সত্যিকারের ওই সবুজ শশাটা জানলা দিয়ে উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

কথাটা সত্যি। এরোপ্লেনটায় রাডার ছিল না। আর রাডার ছাড়া কি এরোপ্লেন উড়তে পারে কখনো? পারবেই না তো। তাই ভেঙে পড়ল বিমান। ডানাদুটো খসে গিয়ে হাওয়ায় উড়ে গেল বাড়ির চালে।

অধ্যায় দুই

দুটি ঘোড়া

লোহার শূন্য কৌটোর মতো ঝনঝন করে উঠল সর্বকর্মা। তবে তার লাগে নি কিছু। দেহটা যে ওর লোহার। শুধু একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল সে। আগে তো কখনো ওড়ে নি।

'সত্যিকারের তুই যাদুকর,' সোল্লাসে বলে উঠল সর্বকর্মা, 'আমি পর্যন্ত জীবন্ত ছবি বানাতে পারি না।'

'এবার আমাদের বাক্সে ফিরি কী করে?' ফুলে ওঠা কপালটায় হাত বুলিয়ে নিশ্বাস ফেললে পেনসিল।

'কী হবে ফিরে!' হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিলে সর্বকর্মা, 'বড়ো ঘেঁষাঘেঁষি ওখানে, অন্ধকার। আমার ইচ্ছে ছুটোছুটি করি, লাফাই, গাড়ি হাঁকাই, উড়ে যাই। আরেকটা এরোপ্লেন এঁকে দে। দুনিয়া ঘুরে বেড়াব। সত্যিকারের এরোপ্লেন দেখব। কত কী দেখব দুনিয়ায়।'

কিন্তু কেন জানি, ওড়ার আর ইচ্ছে ছিল না পেনসিলের।

'তার চেয়ে বরং ঘোড়া আঁকি।'

বাড়িটার শাদা দেয়ালে ভারি সুন্দর দুটি ঘোড়া আঁকলে পেনসিল। পিঠে তাদের নরম জীন, মুখে সোনার জ্বলজ্বলে তারা বসানো চমৎকার বল্গা।

আঁকা ঘোড়াদুটো প্রথমে লেজ নাড়ালে, তারপর ফুর্তির ডাক ছেড়ে দিব্যি বেরিয়ে এল দেয়াল থেকে।

মুখ হাঁ করে মাটিতে বসে পড়ল সর্বকর্মা। কোনো কিছুতে ভয়ানক অবাক হয়ে গেলে অনেকে তাই করে।

'তুই-যে রে এক মহা যাদুকর,' বলে উঠল সে, 'আমার দ্বারা কখনো অমনটি হবে না।'

'আমাদের এখন রওনা দিতে হয়,' প্রশংসায় প্রসন্ন হয়ে পেনসিল বললে সবিনয়ে, 'যেটা খুশি বেছে নিয়ে চেপে বস।'

শাদা ঘোড়াটাই সর্বকর্মার বেশি পছন্দ হল। পটুয়ার ভাগ্যে জুটল পাটকিলেটা।

যে যার ঘোড়ায় চেপে ওরা বেরুল সফর করতে।

অধ্যায় তিন

শহরে ঘোড়দৌড়

শহরের সবচেয়ে সুন্দর চকটার নাম তকতকে চক। এক ট্র্যাফিক-পুলিস সেখানে দাঁড়িয়ে। আশপাশ দিয়ে তড়িঘড়ি ছুটছে মোটরগাড়ি, ঢাউস বাস, লম্বা ট্রলিবাস, ক্ষুদে কার। ফুরুৎ-ফুরুৎ মোটর সাইকেল অধৈর্যে ফটফটিয়ে চেষ্টা করছে সব গাড়িকে ছাড়িয়ে যেতে।

হঠাৎ ট্র্যাফিক-পুলিস বলে উঠল:
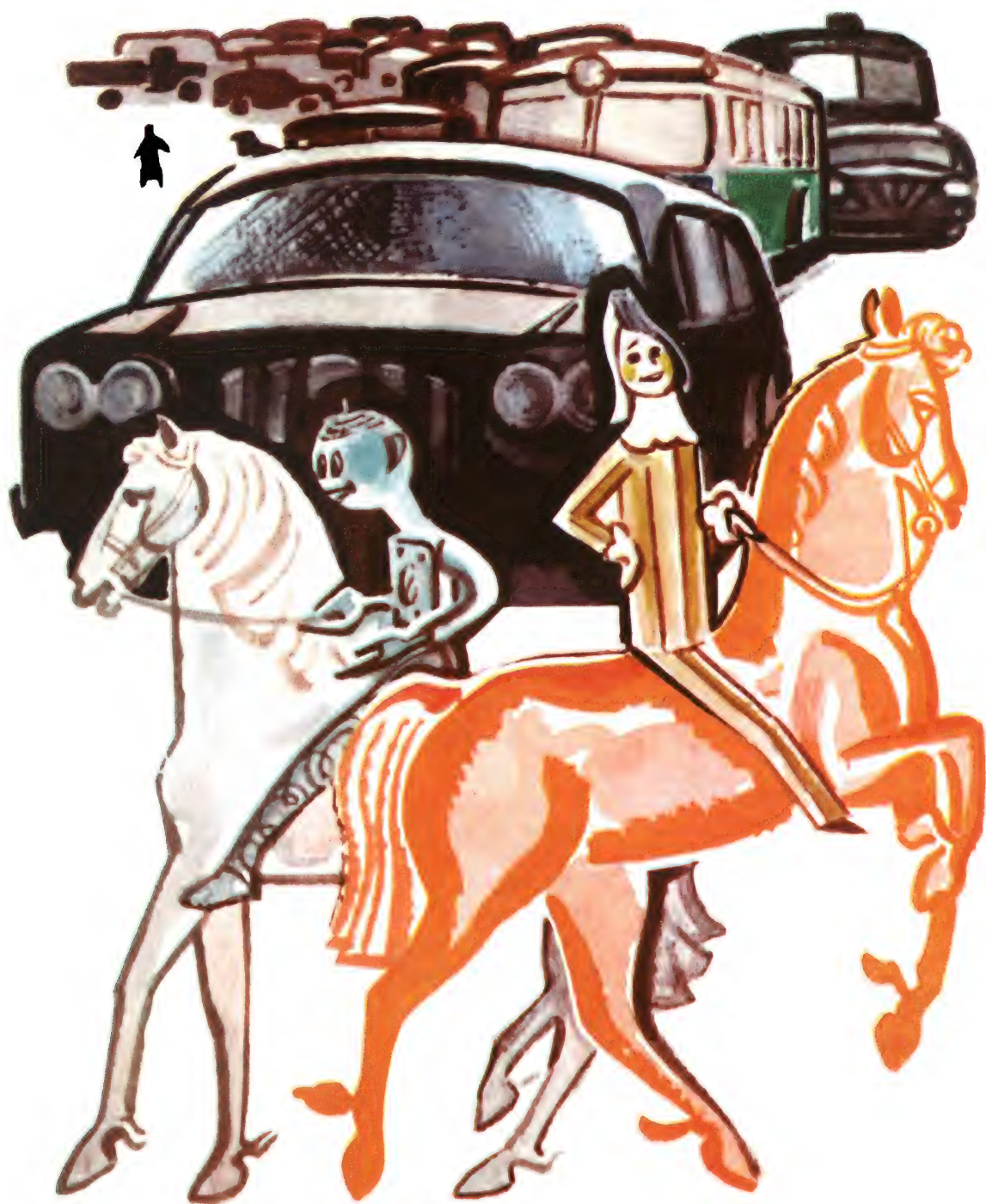
'আরে, এ যে অসম্ভব কাণ্ড!'

রাস্তা, ছোটো বড়ো গাড়িতে গিজগিজ করা শহরের চওড়া রাস্তাটা দিয়ে ছুটে আসছে কিনা ভারি মিষ্টি চেহারার দুটি ঘোড়া। একটির রঙ পাটকিলে, তাতে শাদা শাদা ছোপ। আরেকটি শাদা, তাতে পাটকিলে দাগ। পিঠে তাদের ছোটোখাটো অচেনা দুই সওয়ার, ইতি-উতি চাইছে, ফুর্তি করে গান গাইছে গলা ছেড়ে:

চলছি ঘোড়ায় চেপে
মণ্ডা দেব মেপে,
চলরে ছুটে ঘোড়া,
ঘোড়া দেখে আমি খোঁড়া!

কারা বলো তো? কারা আবার, পেনসিল আর সর্বকর্মা।

চাইছে তারা কখনো ডাইনে, কখনো বাঁয়ে, ঘোড়া ফেরাচ্ছে কখনো এদিকে কখনো ওদিকে, এই ছুটছে, এই আবার থেমে যাচ্ছে সোজা মোটরগাড়ির নাকের ডগায়।

এই সময় ঠোঁটে হুইসিল তুলে প্রচণ্ড এক হুইসিল দিলে ট্র্যাফিক-পুলিস। আচমকা শব্দটায় কেঁপে উঠল সব গাড়ির ড্রাইভার, সব মোটরের শোফার, তাকালে ট্র্যাফিক-পুলিসের দিকে। শুধু দৃকপাত নেই সর্বকর্মা আর পেনসিলের। ট্র্যাফিক-পুলিস হুইসিল দিলে তার মানেটা কী, সে তো তারা জানত না।

চলরে ছুটে ঘোড়া,
ঘোড়া দেখেই খোঁড়া! —

জীনের ওপর দুলতে দুলতে ঘড়ঘড়িয়ে গাইছে সর্বকর্মা। সরু গলায় ধুয়া ধরছে পেনসিল:

ঘোড়া দেখেই খোঁড়া!

'কী বেয়াদবি দ্যাখো দিকি!' ভাবলে ট্র্যাফিক-পুলিস, 'নিয়ম ভাঙছে, গোলমাল পাকাচ্ছে, গিয়ে পড়ছে একেবারে চাকার তলে...'

ট্র্যাফিক-পুলিসের পাশেই ছিল মস্তো এক লাল মোটর সাইকেল। ইঞ্জিন চালু করে সে চলে গেল একেবারে কাঠ-বাদাম রাস্তার মাঝখানটিতে। ট্র্যাফিক-সিগন্যালের লাল আলো জ্বলে উঠল রাস্তায়।

ঘচাঙ করে থেমে গেল সব গাড়ি, নিথর হয়ে গেল বাস, ট্রলিবাস, ট্রাক, মোটর, মোটর সাইকেল, সাইকেল।

থেমে গেল সবাই। শুধু থামার নাম নেই সর্বকর্মা আর পের্নাসলের। ট্র্যাফিক-সিগন্যালের কথা তো তারা কারো কাছে কখনো শোনে নি।

'থামো বলছি!' কড়া গলায় বললে ট্র্যাফিক-পুলিস।

'এই রে!' ফিসফিসিয়ে বললে পের্নাসল, 'দফা সেরেছে!'

ট্র্যাফিক-পুলিস আর দুই নিয়ম-ভাঙা আসামীকে ঘিরে সঙ্গে সঙ্গেই জমে উঠল ছোটো একটা ভিড়।

'নিশ্চয় ওরা সার্কাসের খেলোয়াড়!' মন্তব্য করলে একটা ছেলে।

'কী ব্যাপার হে তোমাদের? নিয়ম ভাঙছ কেন? থাকা হয় কোথায়?'

'আমরা?.. আমরা থাকতাম বাক্সের মধ্যে,' ভয়ে ভয়ে বললে সর্বকর্মা।

'বাক্স? কোনো গ্রামের নাম বুঝি?'

'না, না, সত্যিকারের বাক্স...'

'নাঃ, কিছুই মাথায় ঢুকছে না!' রুমাল বার করে কপাল মুছলে ট্র্যাফিক-পুলিস, 'শোনো, তোমাদের সঙ্গে মস্করার সময় নেই আমার, শুধু বলে দিচ্ছি, ট্র্যাফিকের নিয়ম মেনে চলবে।'

'নিয়মটা কী জিনিস?' জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছে হয়েছিল কৌতূহলী পের্নাসলের, কিন্তু ঠিক সময়েই তার আস্তিন চেপে ধরলে সর্বকর্মা। ট্র্যাফিক-পুলিসের কাছে কি আর ওসব প্রশ্ন করা চলে?

ট্র্যাফিক-সিগন্যালের সবুজ আলো জ্বলে উঠল রাস্তায়। গোঁ-গোঁ করে উঠল মোটরগাড়ি, বাস, ট্রলিবাস, ট্রাক, মোটর সাইকেল, সাইকেল। ঘুরল চাকা, ছুটল গাড়ি।

'সব দোষ এই ঘোড়ার,' ওস্তাদ সর্বকর্মা বললে ভেবে-চিন্তে, 'শহরে যাতায়াত করতে হয় মোটরগাড়িতে।'

অধ্যায় চার

নরম বালিশের চাকা

'বেশ মোটরগাড়ি আঁকা যাক,' বললে পের্নাসল।

'ভেবেছিস কী, মোটরগাড়ি আঁকা অতই সোজা? কিছুই তোর হবে না। আমি পর্যন্ত মোটরগাড়ি বানাতে পারি কেবল খুব ভালো রকমের মেকানো থেকে। সাধারণ একটা স্কুটার অবিশ্যি বানানো যায়। কিন্তু চাকা পাব কোত্থেকে?'

'কেন পারব না?' বাধা দিলে পেনসিল, 'মোটরগাড়ি তো আমি দেখেছি।'

'বেশ, তাহলে আঁক,' মত দিলে ওস্তাদ সর্বকর্মা, 'তবে ভুলিস না, চাকায় টায়ার আঁকবি কিন্তু। টায়ার নইলে খুব ঝাঁকুনি দেবে গাড়ি। সঙ্গে সঙ্গেই আমার ইস্কুপ, বল্টু খুলে আসবে। আর টায়ার — সে হল নরম বালিশের মতো — গাড়ি চলবে মোলায়েম।'

'ঠিক আছে,' বললে কর্মব্যস্ত পেনসিল, 'নরমই হবে, ভাবনা নেই।'

বাড়ির শাদা দেয়ালের গায়ে মোটরগাড়ি আঁকতে লাগল আমাদের ছোট্ট পটুয়া, আর আঁকা ঘোড়াদুটোকে সর্বকর্মা নিয়ে গেল কাছের পার্কটায়, সবুজ লনে, বেঁধে রাখলে লোহার রেলিঙের সঙ্গে।

ফিরে এসে ছবি আঁকা দেখতে লাগল। ভেবেছিল পেনসিলকে কিছু না কিছু উপদেশ দেবে। কিন্তু আঁকা শেষ করে ফেললে পেনসিল।

'হুস!'

বেরিয়ে এল সত্যিকারের এক তৈরি মোটরগাড়ি।

'এ তুই করেছিস কী?' চেঁচিয়ে উঠল সর্বকর্মা, 'চাকার ওপর বালিশ এঁকেছিস কেন?'

সত্যিই নতুন গাড়িটার চাকায় বাঁধা ছিল বালিশ। একেবারে আসল বালিশ। গোলাপী ওয়াড়, শাদা-শাদা ফিতে। পেনসিল তা এঁকেছে খুবই সুন্দর করে।

'নিজেই তো তুই বললি বালিশের কথা।' জবাব দিলে পেনসিল।

'বালিশের কথা আমি মোটেই বলি নি।'

'বলেছিস! আলবৎ বলেছিস!'

'সব তুই গোলমাল করে বসিস। এ গাড়ি আর হাঁকানো যাবে না।'

'আলবৎ যাবে!' রাগ হল পেনসিলের।

'নড়বেও না, যাবেও না। আমি তোর চেয়ে ভালো জানি।'

'যাবে।'

'কিছুতেই না!'

'বস না তুই ড্রাইভারের সীটে।'

'নে বসলাম, কিছুতেই চলবে না।'

পেনসিলের পাশে বসল সর্বকর্মা। গোঁ গোঁ করে উঠল, চলতে লাগল গাড়ি।

'চলছে! চলছে!' চেঁচিয়ে উঠল পেনসিল।

অবাক হয়ে সর্বকর্মা দুই হাতে শক্ত করে স্টিয়ারিং ধরলে। ভারি তার ভয় হচ্ছিল,

এই বুঝি সে ছিটকে পড়ে যাবে। কোনো দিকে তাকিয়ে দেখার ফুরসুত ছিল না তার। তাহলেও চোখে পড়ল পথচারীরা সব তাকাচ্ছে আর আঙুল দেখাচ্ছে তাদের দিকে।

'এ আবার কী গাড়ি রে বাপু, হেসে মরি, বালিশের ওপর চলছে,' বলাবলি করছিল তারা।

অধ্যায় পাঁচ

সফর চলল

আমাদের ছোট্ট পর্যটকেরা অবিশ্যি মোটর ভ্রমণ চালাতে পারে নি বেশিক্ষণ। শোনো বলি কী ঘটল।

রাস্তায় পেন্সিলের চোখে পড়ল অদ্ভুত ধরনের এক গাড়ি, জগদ্দল দুই ঢাকের মতো দেখতে। রাস্তা দিয়ে চলছে তা খুব ধীরে ধীরে। আর রাস্তাটাও কেমন মিশমিশে কালো, তেলতেলে চিকন, অন্য রাস্তাগুলোর মতো নয়। ঝাঁঝালো গরম ধোঁয়া উঠছে সেখান থেকে।

অসাধারণ এই গাড়ি দেখে খুশি হয়ে উঠল সর্বকর্মা:

'দাঁড়া, ওটার সঙ্গে রেস দিয়ে হারিয়ে দিই। সবাই আমাদের ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে, আমরাই বা কম কিসের...'

বলে কায়দা করে সে গাড়ি চালালে কালো রাস্তাটায়।

'ফড়ফড়-ফড়ফড়-ফড়াৎ!..'

চ্যাটচেটে গরম পীচে লেপটে গিয়ে ছিঁড়ে গেল গোলাপী বালিশ।

চাকা থেকে উড়তে লাগল তুলোর ফেঁসো। বাতাসে তা ছড়িয়ে পড়ল ঘরবাড়ি, গাড়ি, ঘোড়া, গাছপালার মাথায়।

'আরে, সিমুল গাছের তুলো উড়ছে নাকি,' বললে একজন পথচারী বুড়ো, 'গ্রীষ্মকালটা তাহলে এবার ভালো যাবে।'

পেন্সিল আর সর্বকর্মার গাড়ি কিন্তু ছুটেই চলল, নরম গোলাপী ন্যাতাকানি শুধু লেপটে রইল রাস্তায়।

শেষ হয়ে গেল রাস্তাটা। সামনে তাদের চওড়া একটা চক। বাঁধানো সেটা পীচ দিয়ে নয়, নুড়ি পাথর দিয়ে।

ভয়ানক ঝনঝন করতে লাগল গাড়ির চাকা। লাফাতে লাগল গাড়িটা, ঝাঁপাতে লাগল, এদিকে টলে ওদিকে হেলে, এই পিছয় এই এগোয়।

স্টিয়ারিঙে নাক থেঁতলে গেল সর্বকর্মার। নরম সীটের ওপর বলের মতো লাফাতে লাগল পেনসিল।

'মম্-মা-শি-স-ক্রু-খু-স,' বিড়বিড় করলে সর্বকর্মা।

আসলে ও বলতে চেয়েছিল: 'মনে হচ্ছে শীগগির আমার ইস্ক্রুপ খুলে আসবে।'

'আঁ-এ-ঝাঁ-ছে-ছিন।' বললে পেনসিল।

আসলে ও বলতে চেয়েছিল: 'আমায় এমন ঝাঁকাচ্ছে যে কী বলছিস বুঝতেই পারছি না।'

'আ-নি-মা-নি-টা-নি...' জবাব দিলে সর্বকর্মা।

আসলে ও বলতে চেয়েছিল: 'এক্ষুনি থামানো দরকার। সত্যিকারের রবারের টায়ার করে নিতে হবে।'

অধ্যায় ছয়

ভোনিয়া কার্শাকিন আর ছবির ডাকু

এই সময় সেখানে উদয় হল কতকগুলো অতি ডানপিটে ছেলের। কোথায় কোথায় ছোটাছুটি করছে তারা, ডাক ছাড়ছে, হাঁকাচ্ছে সত্যিকারের কাঠের তরোয়াল, সত্যিকারের খেলনা পিস্তল। মনে হবে যেন দুর্দান্ত একদল ডাকাত পড়েছে শহরে।

'হুররে!' কলরব করে উঠল ছেলেগুলো, 'হুররে! মার! মার!.. গুড়ুম! গুম!'

আমাদের ক্ষুদে পর্যটকেরা বলতে কি ভয়ই পেয়ে গেল। ভেবেছিল অন্য দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে নেবে, গাড়ি কিন্তু সোজা ছুটল ছেলেগুলোর দিকেই।

সামনে তাদের ঝাঁকড়া-মাথা শণচুলো একটা ছেলে। চোখে তার কালো ডাকাতে চশমা। কালো কাগজ দিয়ে বানানো সত্যিকারের চশমা। মাঝে মাঝে সিনেমায় কি হাসিখুশি কার্নিভালে যা দেখা যায়।

'সবাই আমার পেছু পেছু!' চেঁচাল ছেলেটা, 'ছোটাও ঘোড়া' যদিও ঘোড়া-টোড়া কিছু ছিল না। বোঝা যায়, সর্দারি করতে ছেলেটা ভালোবাসে।

জোর ছোটায় চশমাটা ওর চোখ থেকে পাশের দিকে হেলে পড়েছিল। তাতে

চোখ ঢেকে গিয়ে অসুবিধা হচ্ছিল দেখতে। সম্ভবত সেই জন্যেই ছেলেটা সোজা গিয়ে ধাক্কা খেলে সর্বকর্মার গাড়ির সঙ্গে, নিজে উল্টে পড়ল রাস্তায়।

ঝনঝনিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল গাড়ি, নানান দিকে গড়িয়ে গেল চাকাগুলো।

'অ্যাকসিডেণ্ট!' রাস্তার ওপর বসে থেকেই বললে ছেলেটা।

অন্যেরাও থেমে গিয়ে হাঁপাতে লাগল জোরে জোরে।

'অমন চমৎকার, অমন খাশা গাড়িটাকে একেবারে ভেঙে দিলে!' রেগে বললে সর্বকর্মা। এখন সে ঠিকভাবেই কথা বলতে পারছিল, ঝাঁকুনি তো আর ছিল না।

'আমরা ভাঙি নি,' বললে ছেলেগুলো, 'আমাদের সর্দার ভোনিয়া কাশকিন দৈবাৎ ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে গাড়িটায়।'

'ভাঙি নি!..' ভেঙচাল সর্বকর্মা, 'তাহলে অমন সাঙ্ঘাতিক লাঠি ঘুরিয়ে ছুটে আসছিলি কেন আমাদের দিকে, হাঁক দিচ্ছিলি? তার মানে গাড়ি ভাঙারই মতলব ছিল।'

'এটা লাঠি নয়,' রাগ করলে ছেলেগুলো, 'এ হল তরোয়াল। সত্যিকারের তরোয়াল। আমরা ডাকাত-ডাকাত খেলছি। ভোনিয়া আমাদের সর্দার...'

অজানা একটা শব্দ শোনা মাত্র উৎকর্ণ হয়ে উঠল পেনসিল। এমন কি ভাঙা গাড়ির কথাটাও সে ভুলে গেল — এতই কৌতূহলী সে।

'কী বললে, ডাকাত?' জিজ্ঞেস করলে সে।

'হ্যাঁ, আমাদের পাড়ায় সব ছেলেই ডাকাত আর গুপ্তচরের খেলা খেলে।'

'আচ্ছা, ডাকাত আর গুপ্তচর কেমন হয় বলো না?' জিজ্ঞেস করলে সরলমনা পেনসিল।

'ছ্যোঃ!' বিদ্রূপ করে উঠল ভোনিয়া কাশকিন, 'এই সামান্য কথাটাও জানে না। বই পড়তে হয় রে, বই পড়তে হয়...'

'আমায় একটা ডাকাত আর একটা গুপ্তচর এঁকে দাও-না, ওদের চেহারাটা একটু দেখে নিই।' মিনতি করলে ছোট্ট পটুয়া। ওর ধারণা দুনিয়ার সবাই বুঝি ছবি আঁকতে পারে। 'নিশ্চয় দারুণ কিছু একটা হবে।' বললে পেনসিল, 'অথচ আমি ওদের সম্পর্কে কিছুই জানি না। মোটরগাড়ি দেখলাম, কিন্তু ডাকাত আর গুপ্তচর এখনো দেখি নি। সবকিছু আমায় জানতে হবে। এঁকে দেখাও-না ভাই।'

'কী আমার সখ, তোমায় এখন এঁকে দেখাই। আমার এদিকে সময়ই নেই।' গজগজ করলে ভোনিয়া।

ছেলেগুলো বললে:

'আঁক ভোনিয়া, এ'কে দে একটা জলদস্যু আর একটা গুপ্তচর।'

'এই নাও আমার রঙ-তুলি,' বললে পেনসিল। পকেট থেকে বার করলে রঙের বাক্স, ধবধবে শাদা একখানা কাগজ, দাগ মোছার নরম রবার।

'তা, সবাই যখন বলছে, বেশ, এ'কে দিচ্ছি।' রাজী হয়ে গেল ভোনিয়া।

চশমা খুলে রঙ-তুলি নিয়ে সে আঁকতে বসল।

শাদা কাগজটায় প্রথমে ফুটে উঠল মস্তো একটা কালো ছোপ, খোঁচা খোঁচা লোমের বদরাগী এক কুকুরের মতো দেখতে। আসলে ওটা অসাবধানে পড়ে যাওয়া এক ফোঁটা রঙ। তারপর কিন্তু শণচুলো ছেলেটা যে-ছবি আঁকলে-না, সে এক ভয়াবহ ছবি।

প্রকাণ্ড পাটকিলে দাড়িওয়ালা এক হিংস্র মূর্তি, গায়ে তার নাবিকদের মতো ডোরাকাটা গেঞ্জি, তার ওপর জাহাজী কোট, হাতে তার ডাকাতদের কালো পতাকা, তাতে আড়াআড়ি দুই শাদা হাড় আর মানুষের খুলি আঁকা। লোকটার কোমর থেকে ঝুলছে প্রকাণ্ড এক বাঁকা ভোজালি, আর সেকেলে দুই ডাকাতে পিস্তল। পাশেই কলার তোলা, ধূসর রেন-কোট মুড়ি দেওয়া আরেকটা লোক, কালো মুখোসে মুখ ঢাকা, নাকটা বিছছিরি আর লম্বা।

কালো পতাকা দোলাচ্ছে দেড়েল লোকটা, আর অন্য লোকটি, নিশ্চয় গুপ্তচর, কালো মুখোসের ফুটো দিয়ে কুচুটে চোখে নজর করছে সবাইকে।

'এ হল ডাকাত, মানে জলদস্যু, লেখাপড়া জানা লোকে যাদের বলে বোম্বেটে। আর এ হল গুপ্তচর।' বুঝিয়ে দিলে ভোনিয়া।

'খাশা হয়েছে!' তারিফ করলে ছেলেগুলো, 'একেবারে সত্যিকারের মতো।'

'বিদ্ঘুটে!' ফিসফিস করলে সর্বকর্মা।

'বাবারে, কী ভয়ঙ্কর!' শিউরে উঠে বললে পেনসিল, 'অমন সাঙ্ঘাতিক ছবি আমি জীবনেও আঁকব না।'

'হা-হা!' বললে ভোনিয়া, 'স্রেফ আমার মতো আঁকতে পারিস না, তাই বল।'

'কী বললি, আমি আঁকতে পারি না?' অভিমান হল পেনসিলের (শিল্পীরা দারুণ অভিমানী হয় তো)।

'কী বললি, পেনসিল আঁকতে পারে না?' স্প্রীঙগুলো দিয়ে খে'কিয়ে উঠল সর্বকর্মা।

ক্ষুদে পটুয়া যে তক্ষুনি আঁকতে লেগে যাবে, সে আর বলতে। সত্যিকারের শিল্পীরা কী ভাবে আঁকে, দেখুক সেটা ভোনিয়া কাশকিন।

'ফুঃ!' আঁকা দেখে বললে ভোনিয়া, 'জানি, জানি, এক গোল্লায় মুখ, আরেক গোল্লায় পেট, ফুটকি দিয়ে চোখ, ও ঢের জানা আছে...'

'মোটেই গোল্লা টোল্লা নয়, খোকন আঁকছি...' আপত্তি করলে পেনসিল।

'চল রে সব যাওয়া যাক। এদের সঙ্গে বকবক করার সময় নেই! সবাই আমার পেছনে,' রেগে হুকুম দিলে ভোনিয়া।

ছেলেরাও তরোয়াল আস্ফালন করে ছুটে গেল তার পেছু পেছু। তবে ছোট্ট একটা ছেলে থেকে গেল রাস্তাতেই।

ভাবছ, কোন ছেলেটা? আরে, কোনটা আবার, যাদুকর পটুয়া পেনসিল যে ছেলেটাকে এ'কেছিল।

ছি-ছি-ছি, পেনসিল। অমন না ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হয় কখনো? এ'কে দিলে সত্যিকারের খোকন। কিন্তু তারপর? কে তাকে মানুষ করবে? খাওয়াবে, পরাবে, নজর রাখবে? ছি-ছি...

খোকন বসে বসে চোখ পিটপিট করতে লাগল।

অধ্যায় সাত

বাড়ি বানানো

'নাম কী রে তোর?' এ'কে তোলা খোকনকে জিজ্ঞেস করলে পেনসিল।

খোকন জবাব দিলে না।

'উপাধি তোর কী?'

চুপ করেই রইল খোকন। আঙুল দিয়ে সে ঠোঁট নাড়াতে লাগল। মানে, ওপর থেকে নিচে। ফলে ভারি হাস্যকর একটা শব্দ বেরুল — 'প্-র-র-রুৎ'। সেটা ভারি ভালো লেগে গেল খোকনের। আবার সে আঙুল চালালে: 'প্র-র্-র-রুৎ! প্রুৎ! প্রুতিয়া!'

'কে তুই?' ছেলেটাকে নাড়া দিলে সর্বকর্মা।

'প্র-র্-র্-রুৎ! প্রুৎ! প্রুতিয়া!' খেলা জুড়লে খোকন।

'ওর নাম প্রুতিয়া,' লাফিয়ে উঠল পেনসিল, 'শুনছিস না, বলছে, "আমি প্রুতিয়া"।'

'তাই তো, প্রুতিয়াই বটে!' খুশি হয়ে উঠল সর্বকর্মা, 'প্রুতিয়া, প্রুতিক! দিব্যি নামখানা। প্রুতিক, চল আমাদের সঙ্গে দেশ ভ্রমণে।'

দেশ ভ্রমণ কী জিনিস, ছোট্ট প্রুতিক নিশ্চয় তা জানত না। জানলে নিশ্চয় রাজী হয়ে যেত। খোকন কোনো জবাব না দিয়ে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তার পা চেপে ধরলে। আরেকটু হলেই পড়ে যেত সর্বকর্মা।

'অ্যাই, দুষ্টুমি করবি না বলে দিচ্ছি,' রেগে উঠল সে।

খোকন ফের তার 'প্ররররুৎ, প্রুৎ, প্রুতিয়া' শুরু করলে।

'ও যে কথা বলতেও পারে না। কী করা যাবে ওকে নিয়ে?' বলে উঠল লোহার মানুষ।

এমন সময় সর্বকর্মার চাঁদির ওপর ঝন করে পড়ল এক ফোঁটা জল। সাধারণ বৃষ্টির জল।

'হুঁম!' ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল সর্বকর্মা, 'বৃষ্টি নামছে দেখছি।'

আকাশ ছেয়ে গেল কালো মেঘে। শঙ্কিতভাবে মেঘের দিকে চাইছিল পথচারীরা, কলার তুলে দিয়ে শশব্যস্তে ছুটছিল যে যার গন্তব্যে — ফটক, দোকান, ট্রলিবাসের দিকে। ছুটছিল না কেবল ট্র্যাফিক-পুলিস। শান্তভাবে সে দাঁড়িয়ে রইল একেবারে চকের মাঝখানটিতে: ট্র্যাফিক-পুলিসেরা কখনো বৃষ্টিতে ভয় পায় না।

'আয়, বৃষ্টি ঝেঁপে!' ফুর্তিতে চেঁচামেচি লাগালে ছেলেগুলো, 'আয়, বৃষ্টি ঝেঁপে!'

বাজ ডেকে উঠল, নামল বৃষ্টি। খুব জোরে নয় বটে, একটু গরম-গরম, তাহলেও ভিজিয়ে তো দেবে।

'অসুখ করে বসবে যে ছেলেটা। ভিজে যাবে, ঠাণ্ডা লাগবে!' চেঁচিয়ে উঠল সর্বকর্মা।

প্রুতিয়ার হাত ধরে ওরা ছুটে গেল বুলভারে, আড়াল নিলে একটা ঝোপের তলে।

'টুপ-টাপ, টুপ-টাপ! ঝুপ! টুপটাপ! ঝুপ!'

শহরের ওপর যেসব ফেঁসো উড়ছিল, বৃষ্টিতে তা নেমে আসছিল মাটিতে, জলের মধ্যে পড়ে থাকছিল গলন্ত বরফের মতো।

তবে নড়েচড়ে উঠল মেঘের নরম কুণ্ডলী, উড়ে গেল তা যেখানে যাবার। কটাক্ষে বৃষ্টির দিকে চাইলে সূর্য, বৃষ্টিরও টিপ-টিপানি বন্ধ হয়ে গেল।

এদিক ওদিক চেয়ে দেখল সর্বকর্মা।

'হতচ্ছাড়া বৃষ্টিটা থামল, নাকি থামে নি?'

'থেমেছে, থেমেছে! বেরিয়ে আয়!'

'ফের যদি হঠাৎ শুরু হয়?'

'আর হবে না।'

'ভারি ভয় পাই বৃষ্টিকে। ছোটোখাটো একটা বাড়ি এঁকে দে বাপু, মাথায় যেন সত্যিকারের ছাদ থাকে। ওই মাগো!' আঁতকে উঠল সর্বকর্মা, আর হেসে উঠল পেনসিল।

মস্তো এক ফোঁটা জল দুলছিল গাছের ডালে। দুলতে দুলতে টুপ করে তা পড়ে যায় সোজা অসতর্ক সর্বকর্মার নাকের ডগাটিতে।

সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার ঢুকে পড়ল ঝোপের তলে।

'ঘর তৈরি না হওয়া পর্যন্ত আর বেরুচ্ছি না!'

হলুদ বালি বিছানো ছিল ঝোপের তলে, তার ওপরেই বাড়ি আঁকল পেনসিল।

মানে হ্যাঁ, বানালে না, আঁকলে। তাতে অবাক হবার কিছু নেই। সব বাড়িই তো আগে আঁকে — অবিশ্যি কাগজের ওপর, গড়ে তার পর।

বাড়ির চালের শেষ তক্তাটা এঁকে পেনসিল বললে, 'তৈরি!'

আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সর্বকর্মা।

একেবারে যেন এক রূপকথা! সামনে তার উঁচু চাল সমেত এক নতুন বাড়ি।

'চমৎকার!' তারিফ করলে সর্বকর্মা, 'কিন্তু কুয়োটা আঁকলি কেন? কলের জলের পাইপ আঁকতে হত...'

সত্যিই, বাড়ির কাছে ছিল সত্যিকারের এক কুয়ো। তার ওপর কপিকলে ঝুলছে বালতি। জলের কল আঁকতে পেনসিল জানত না। তবে কুয়োটি উৎরেছে খাশা।

'জলের কল কী তাতো জানি না,' দীর্ঘশ্বাস ফেললে পেনসিল, 'জীবনের কত অল্প জিনিসই না আমি আঁকতে জানি।'

'যাক গে,' সান্ত্বনা দিলে সর্বকর্মা, 'আমি তোকে পরে বুঝিয়ে দেব। এখন প্রুতিকের একটা ব্যবস্থা করতে হয়। একেবারে ভিজে গেছে ও। কিন্তু যাঃ! কোথায় প্রুতিক? প্রুতিক, শীগগির আয় বলছি!'

ডালপালা সরিয়ে দেখল সর্বকর্মা, খোঁজাখুঁজি করলে ঝোপের তলে, কিন্তু কোথাও প্রুতিক নেই। পালিয়েছে সে।

'হলো তো, আমি আগেই জানতাম। খোকনকে তোর হাতে ছেড়ে দিয়ে ভরসা নেই।' অস্থির হয়ে উঠল পেনসিল, 'প্রুতিককে খুঁজে বার করতে হয়। গাড়ি চাপা পড়বে হয়তো। ভারি যে ছোট্ট...'

অধ্যায় আট

নৌকো ভাসানো

লক্ষ করেছ কখনো, বৃষ্টির পর কেমন অপূর্ব হয়ে ওঠে শহর? রাস্তা দিয়ে কলকলিয়ে ছোটে জলের স্রোত, খালি পায়ে তাতে লাফালাফি করা কী মজা! চারপাশের সবকিছুই ঝিলমিল করে জলের ছিটকানিতে। জলের মধ্যে প্রাণভরে চক্কর খায় গাড়ির চাকা। আর সারা শহর জুড়ে নাচানাচি করে রোদ্দুরের ছোপ। স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটে বাচ্চারা। বৃষ্টি থেমে গেছে! বৃষ্টি!..

প্রুতিকও ছুটছিল বাচ্চাদের সঙ্গে। খিলখিল করে হাসছিল সে, দুমদাম পা ফেলছিল জলে। ছুটছিল তার নতুন স্যান্ডালের পেছন পেছন, দুলতে দুলতে স্রোতে তা ভেসে যাচ্ছিল খেলনা নৌকোর মতো।

আর সারা রাস্তা জুড়ে কেবল নৌকো। কাগজের, কাঠের, পাল তোলা, দম দেওয়া, এমন কি স্রেফ একটা চটা, তাতে কাঠির মাস্তুল। শত শত জাহাজ ভেসেছে দূর যাত্রায়।

'জাহাজ! জাহাজ!' চেঁচাচ্ছিল বাচ্চারা।

'জাহাজ!' হঠাৎ বুলি ফুটল খোকন প্রুতিয়ার মুখে।

তোমাদের শহরে কী হয় জানি না, তবে এ শহরে বৃষ্টির পর রাস্তায় সর্বদাই জাহাজ ভাসে। শুধু আজকে তারা সংখ্যায় অজস্র।

'জাহাজ আজ এত বেশি কেন হে?' বলাবলি করছিল পথচারীরা।

'আরে জানেন না? কাল আমাদের শহরে যে জাহাজের এক বিরাট প্রতিযোগিতা আছে।'

'কোথায় বলুন না?'

'চিড়িয়াখানার বড়ো মরাল সরোবরে। আমার ছেলেও কিশোর টেকনিশিয়ান, সেও যোগ দেবে।'

জাহাজগুলো দেখে এই সব কথা বলছিল লোকেরা। জাহাজগুলোর জন্যে পথ ছেড়ে দিচ্ছিল মোটরগাড়ি। মোড়ে মোড়ে ট্র্যাফিক-পুলিস সব গাড়ি থামিয়ে রাস্তা খুলে দিচ্ছিল ভাসন্ত জাহাজগুলোকে।

ভারি আনন্দ হচ্ছিল প্রুতিয়ার। লাফালাফি করছিল সে: 'ছপ্, ছপ্, ছলাৎ'।

পাশেই ছুটছিল ভেনিয়া কাশকিন। হাসছিল সে। তবে নিজে সে কোনো জাহাজ

বানায় নি। ছুটতে ছুটতে সে ঢিল মারছিল প্রুতিয়ার স্যাণ্ডাল লক্ষ্য করে। হুকুম দিচ্ছিল:

'গোলন্দাজ, চালাও কামান!'

'দুম! দাম!' ছুটল ঢিল।

গোলা পড়ল স্যাণ্ডাল-রূপী জাহাজে। ঢেউয়ের সাপটে জাহাজ তলিয়ে গেল নিচে।

'ঘায়েল!' বলে ভেনিয়া কার্শাকিন এবার নিশানা করতে লাগল আরেকটা কাগজের নৌকোকে।

এই সময় রাস্তায় এসে দাঁড়াল সর্বকর্মা আর পেনসিল। প্রুতিককে দেখে তারা হাত নাড়লে, চেঁচালে, ছুটল তার পেছন পেছন।

'প্রুতিয়া!'

'বিটকেলে ছেলে!'

'এক্ষুনি বাড়ি আয় বলছি।'

প্রুতিক কিন্তু কিছুই শুনছিল না। ফুর্তিতে সে গাইছিল:

'ছোট্ট জাহাজ! ছোট্ট জাহাজ!'

'পা ভেজাচ্ছিস তুই! অসুখে পড়বি!' শুকনো ফুটপাথের ওপর লাফাতে লাফাতে বললে সর্বকর্মা। ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে।

বুঝতেই পারছ, খোকনের পাল্লা ধরতে সর্বকর্মার মোটেই বেগ পেতে হয় নি, কিন্তু জলে নামতে ভয় হচ্ছিল তার, তাই প্রুতিককে ধরতে পারছিল না।

'কী, কথা কানে যাচ্ছে না!'

'ছোট্ট জাহাজ!' ছোট্ট জাহাজ!' চিঁচিঁ করলে প্রুতিয়া।

'আহ্, থাম প্রুতিক, থাম-না! আয়, তোকে একটা গল্প বলি, শুনবি? শুধু একবারটি এখানে আয়। ওহ্, কী দারুণ গল্প!.. শোন, "এক যে ছিল... ছোট্ট, অবাধ্য এক... রেল-ইঞ্জিন..." জলে ছুটিস না প্রুতিক!'

প্রুতিকের কিন্তু জাহাজগুলো ছাড়া আর কোনো দিকেই দৃষ্টি নেই।

'আরে শোন, তোকে আমি এমন একটা জাহাজ বানিয়ে দেব-না! সবচেয়ে খাশা! সত্যিকারের জাহাজ!'

সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেল খোকন, সর্বকর্মাও অমনি তার জামা চেপে ধরল, দৌড়ের চোটে দম প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল তার।

'জাহাজ! জাহাজ দাও!' বললে প্রুতিয়া।

'পাবি জাহাজ, পাবি! ওহ্, হাঁপিয়ে গেছি!.. বাড়ি চল! আগে গা-হাত-পা

মুছবি, গরম জুতো পরবি, তারপর জাহাজ বানাতে বসব। পেনসিল, আমাদের তুই এক জোড়া নতুন জুতো এ'কে দে তো। আর আমার জন্যে এ'কে দে দরকারী সব যন্ত্রপাতি: পাইন কাঠের দুটো তক্তা, আর নানা রকম ইস্ক্রুপ। দায়ে ঠেকেছি, বানাতেই হবে জাহাজ।'

ছুটে এল ওরা বাড়িতে, প্রুতিকের পোষাক ছাড়ানো হল, পেনসিলের আঁকা তুলতুলে একটা তোয়ালে দিয়ে গা মুছিয়ে বিছানায় শোয়ানো হল খোকনকে।

এটাও যাদুকর পটুয়ারই কাজ।

গদি আঁটা খাট, লেপ, সুন্দর সুন্দর চেয়ার, গোল টেবিল, টাটকা সে'কা লালচে রুটি, গরম দুধের কাপ, মস্তো একটা চুল্লি (যদি দরকার পড়ে আর কি) — সবই এ'কে দিয়েছিল পেনসিল।

শুধু ঘড়িটা সে আঁকে নি। কেন জানি, দেয়ালে সেটা টাঙানো ছিল আগে থেকেই। সেই সাবেক কালের ঘড়ি, জানো তো, দেয়ালে যা টাঙানো হত, তলে একটা গোল দোলক দুলত: 'টিক-টিক, ঠিক-ঠিক, কী বেঠিক...'

বাড়ির মধ্যে ঘড়িটা যে কেমন করে দেখা দিল কেউ জানে না। তবে যাদুকরদের ব্যাপারই তো ওই — তাজ্জব কিছু-না-কিছু একটা ঘটবেই ঘটবে।

এ সব তাজ্জবে সর্বকর্মার এখন আর তাক লাগে না। অবিশ্যি এও ঠিক, তখন তার শুধু এক দুশ্চিন্তা, প্রুতিক আবার অসুখে না পড়ে।

খোকন কিন্তু কিছুতেই ঢুকছিল না লেপের তলে, গরম দুধ খেতে চাইছিল না। কত রকম করে বোঝাতে হচ্ছিল সর্বকর্মাকে। শেষ পর্যন্ত সে বললে:

'আমার কথা যদি না শুনিস, তাহলে তোকে জাহাজ বানিয়ে দেব না কিন্তু।'

বুঝতেই পারছ, সঙ্গে সঙ্গেই দুধ খেয়ে নিলে প্রুতিক।

এদিকে সন্ধ্যা নেমেছিল।

'ওহ্, ভারি হয়রানি গেছে আজ!' লালচে রুটি আর এক কাপ দুধ খেয়ে (যাদুকররাও দুধ খায় বৈকি) নিশ্বাস ছাড়লে পেনসিল, 'বড্ডো ঘুম পাচ্ছে!' বলে হাই তুললে সে। (যাদুকররাও মাঝেমাঝে হাই তোলে)

'বটেই তো,' বললে সর্বকর্মা, 'খোকনের এখন ঘুমের সময়। সব ছেলেমেয়েই এসময় ঘুময়। প্রুতিক, চোখ মিটমিট করবি না বলছি। এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়। তাহলে তোকে গল্প বলব...'

'তুই ছেলে মানুষ করতে জানিস না,' বললে পেনসিল, 'বাচ্চাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয়।'

ক্ষুদে পটুয়া প্রকাণ্ড এক হাই তুলে কোট-প্যাণ্ট ছাড়লে, খাটের কাছে একটা হুক এঁকে নিল দেয়ালে, তাতে জামা-কাপড় ঝুলিয়ে শুয়ে পড়ল পরিষ্কার ধবধবে বিছানায়, লেপ মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল।

'ঘুম-কাতরে!' বলে গল্প জুড়লে সর্বকর্মা: 'এক যে ছিল ছোট্ট এক অবাধ্য রেল-ইঞ্জিন...'

খোলা জানলা দিয়ে ভেসে আসছে ঝোপ-ঝাড়ের মর্মর, যেন ঝোপ নয়, বড়ো বড়ো গাছ সেগুলো। কাছেই কোথায় যেন দুমদাম পা ফেলে ছুটছে ছেলেপিলেরা। চলে গেল তারা। শান্ত হয়ে গেল বুলভার — নাম তার নীল-ঠাণ্ডা বুলভার। রাত নামল। আর বুলভারের সবচেয়ে চুপচাপ জায়গাটায় ঘন ডালপালার নিচে যে একটা অসাধারণ বাড়ি লুকিয়ে রইল, সেটা কেউ দেখতে পেলে না।

অধ্যায় নয়

ইঁদুর, বেড়াল

নীল, সবুজ, শাদা, লাল, কালো, ডোরাকাটা ইঞ্জিনের স্বপ্ন দেখছিল সর্বকর্মা।

লাইনের ওপর দিয়ে ছুটছিল তারা, সরু সরু নলে হুইসিল দিচ্ছিল: 'ভোঁ-ওঁ-ওঁ, ভোঁ-ওঁ-ওঁ!'

হঠাৎ একটা ইঞ্জিন ক্যাঁচক্যাঁচ করতে লাগল, যেন চাকায় তার তেল পড়ে নি: 'ক্যাঁচ, ক্যাঁচ, কিঁচ!'

এমন করুণ স্বরে জোরে জোরে তা ক্যাঁচক্যাঁচ করছিল যে সর্বকর্মা তাকে থামালে, এবং বুঝতেই পারছ, তেল দিলে তার বারোটি চাকার সবকটায়। ইঞ্জিনটা স্বপ্নে দেখলেও, আশেপাশে শাদা, কালো, ডোরাকাটা বা লাল কোনো ইঞ্জিন আসলে না থাকলেও, সে ইঞ্জিন ক্যাঁচক্যাঁচ করবে, এ কি সে চলতে দিতে পারে? তাই মস্তো একটা টিন থেকে চাকায় তেল দিতে লাগল সর্বকর্মা। ইঞ্জিনটা কিন্তু আরো জোরে ক্যাঁচক্যাঁচ করতে লাগল: 'ক্যাঁচ, কিঁচ, কিঁচ...'

'ব্যাপারটা কী?' স্বপ্নের মধ্যে বললে ওস্তাদ সর্বকর্মা, আর বলতেই ঘুম ভেঙে গেল।

চুপচাপ ঘরখানা। জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে, চালের ওপর সড়সড় করছে পাতা। কোণের দিকে আহ্লাদে তাল দিচ্ছে ঘড়ি: 'টিক-টিক, কী বেঠিক'। চোখ বুজলে সর্বকর্মা, সঙ্গে সঙ্গেই ঘর ফাটিয়ে ডাক শোনা গেল: 'কিঁচ, কিঁচ, কিঁচ!'

আসলে কিঁচকিঁচ করছিল একটা ইঁদুর।

ঘুমতে চাইছিল সর্বকর্মা, কিন্তু বেড়েই চলল ইঁদুরের কিঁচকিঁচানি।

তখন বেয়াক্কেলে ইঁদুরটাকে ভয় দেখাবার জন্যে দেয়ালে থাপ্পড় মারলে সর্বকর্মা, কিন্তু এমন মরীয়ার মতো ডাকতে লাগল ইঁদুরটা যে পেনসিল আর প্রুতিয়াও জেগে উঠল।

'কে রে? কে এটা?' জিজ্ঞেস করলে পেনসিল।

'আচ্ছা, ইঁদুর তুই আঁকলি কেন, বল তো?' গজগজ করলে সর্বকর্মা।

'ইঁদুর আমি আঁকি নি তো!' বললে পেনসিল, 'মাইরি বলছি, ইঁদুর আঁকি নি।'

'আছিস বেশ, ইঁদুর আঁকেন নি উনি, আর ইঁদুর ওদিকে কিঁচকিঁচ করছে। তাহলে আঁকলটা কে? আমি?' বললে সর্বকর্মা।

ইঁদুর ওদিকে কিঁচকিঁচ করে চলেছে ক্রমেই জোরে জোরে। পেনসিল আর পারলে না, এক পাটি জুতো নিয়ে ছুড়ে মারলে অন্ধকার কোণটায়। এক মুহূর্তের জন্যে চুপ করে গেল ইঁদুরটা, কিন্তু তারপর...

'কিঁচ! কিঁচ! কিঁচ!' ফুর্তিতে বলে উঠল প্রুতিয়া।

'কিঁচ, কিঁচ, কিঁচ!' সাড়া দিলে ইঁদুর।

'ছেলেটা ঘুমচ্ছে না দেখছি,' ব্যস্ত হয়ে উঠল সর্বকর্মা।

'নাহ্, আর পারা যায় না!' চেঁচিয়ে উঠল পেনসিল।

উঠে পড়ল সে। তারপর কী করল, বলো তো? স্রেফ একটি বেড়াল এঁকে দিলে। আহ্লাদী, লোম-ঝুমঝুম, ছেয়ে রঙের বেড়াল।

সঙ্গে সঙ্গেই শান্তি ফিরে এল ঘরটায়। কেন জানি, আর কিঁচকিঁচ করলে না ইঁদুরটা। বাঁ পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সর্বকর্মা। লেপের মধ্যে সেঁধল পেনসিল, আর তারপর...

আঁকা বেড়ালটা প্রথমে ঘরময় ঘুরে বেড়াল, তারপর কানে গেল ঘড়ির আওয়াজ:

'টিক-টিক! ঠিক-ঠিক!' তারপর চোখে পড়ল দোলকটা। সবুজ চোখে চেয়ে দেখে সে মিউ-মিউ করলে। ওর মনে হল ওটা লম্বা সরু লেজওয়ালা একটা গোলগাল ইঁদুর।

গুঁড়ি মেরে এসে ঝাঁপ দিলে সে। অমনি ঘড়ি, দোলক আর আঁকা বেড়ালটা ভয়ঙ্কর আওয়াজ আর মিউ-মিউ শব্দে ধপাস করে পড়ল মেঝের ওপর।

'না, আর পারা যায় না!' চেঁচিয়ে উঠল সর্বকর্মা।

'ছেই! ছেই!' বলে বেড়ালের দিকে দ্বিতীয় পাটি জুতোটা ছুড়লে পেনসিল।

প্রুতিয়া কিন্তু হাততালি দিয়ে হেসে উঠল। মজা লাগছিল ওর।

তিনজনেই ওরা ছোটাছুটি লাগালে বেড়ালটার পেছনে। ওরা চ্যাঁচাচ্ছিল, মিউ-মিউ করছিল বেড়ালটা, ছুটে বেড়াচ্ছিল ঘরময়। উল্টে পড়ল চেয়ার, ভেঙে পড়ল পেয়ালা। শেষ পর্যন্ত নিজেই বেড়ালটা বুদ্ধি করে পালিয়ে গেল জানলা দিয়ে।

'বেড়ালটা তুই আঁকতে গেলি কেন বল তো?' জিজ্ঞেস করলে সর্বকর্মা।

'খোকন এখনো পর্যন্ত ঘুমচ্ছে না,' বললে পেনসিল, 'এমন হলে তো চলবে না।'

'ঘুমতে হবে!' কড়া করে বললে সর্বকর্মা।

খোকনকে লেপ ঢাকা দিয়ে সে নিজের খাটে শুয়ে পড়ল। শীগগিরই ফের শাদা, কালো, ডোরাকাটা ইঞ্জিনের স্বপ্ন দেখতে লাগল সে।

অধ্যায় দশ

প্রুতিকের চাঁদে যাত্রা

ভোর বেলায় সর্বকর্মা স্প্রীঙের মতো লাফিয়ে উঠল বিছানায়, সন্ধ্যায় যে খাটে প্রুতিককে শুইয়েছিল, তাকাল সে দিকে, এবং চেঁচিয়ে উঠল:

'প্রুতিক হারিয়ে গেছে! এই পেনসিল, উঠে পড়! প্রুতিক নেই!'

সত্যিই বিছানাটা শূন্য।

দরজা খুলে ওরা ছুটে বেরুল বাইরে, জানে না যাবে কোথায়। হঠাৎ... দেখা গেল প্রুতিককে।

বলো তো কী করছিল প্রতিক। স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। গাছের ডালে প্যাণ্ট নাকি জামা আটকে ঝুলছিল খোকন। স্বচ্ছ একটা প্যাকেটে মাথা আর মুখ ঢাকা। সাধারণ প্যাকেট, যাতে সাধারণত পাঁউরুটি রাখা হয়, যাতে শুকিয়ে না যায়।

ডালের নিচে একই রকম প্যাকেট মাথায় এক দল ছেলে। একটি ছেলেকে মনে হল দলপতি। হুকুম দিলে সে:

'ওড়ার জন্যে তৈরি হয়ে যাও! রেডি?'

'রেডি!' সমস্বরে বলে উঠল ছেলেগুলো।

'রেডি!' চিঁচিঁ করলে প্রতিক।

'রকেট লাগাও!'

যে ডালটায় ভারি খুশি হয়ে জ্বলজ্বলে মুখে ঝুলছিল প্রতিক, সেটাকে ছেলেগুলো প্রাণপণে চেপে ধরে নুইয়ে আনলে...

কিন্তু পেনসিল আর সর্বকর্মা এই সময় পাগলের মতো হাত নাড়তে নাড়তে ছুটে গেল ছেলেগুলোর দিকে, 'রকেট-বিশারদরাও' অমনি চটপট চম্পট দিলে দিগ্বিদিকে।

নোয়ানো ডাল ছাড়া পেতেই ছিটকে সিধে হয়ে গেল, প্রতিকও অমনি ডালের সঙ্গে উঠে গেল উঁচুতে।

'হুররে!' দূর থেকে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল ছেলেগুলো, 'কক্ষপথে পেঁছে গেছে! কক্ষপথে!'

ডাল থেকে প্রতিককে নামিয়ে আনার জন্যে আঁকতে হল মই। ভারি অস্থির হয়ে পড়েছিল পেনসিল, তাই মইটা দাঁড়াল একটু বাঁকাচোরা। ডাল থেকে খোকনকে নামিয়ে এনে সর্বকর্মা রাগী-রাগী মুখে তার দিকে চেয়ে মাথা নাড়লে:

'ছেলেটাকে নিয়ে দেখছি ভুগতে হবে অনেক। আরেকটু বাড়াবাড়ি হলেই বোধ হয় দুর্ভাবনায় আমার ইস্ক্রুপ খুলে আসবে।'

'ছি-ছি-ছি!' কড়া করে ধমক দিলে পেনসিল।

'তুই ওকে এমন অবাধ্য করে আঁকলি কেন, বল তো?' ছেলেটাকে বাড়ি আনতে আনতে বললে সর্বকর্মা, 'আর তুই প্রতিক, বাড়ি থেকে পালাতে হয় কখনো?'

'ওকে কিছু শুধিয়ে লাভ নেই,' বললে পেন্সিল, 'এখনো ও কথা বলতে পারে না, বোঝেও না কিছু।'

'পারি!' হঠাৎ বলে উঠল প্রুতিক, 'কথা বলতে পারি... চাঁদ... রকেট... ক-ক্ষ-পথ... হেলমেট... ফুট-বল, ফ্রু-স...'

'ইস, কী সব কটরমটর কথা!' অবাক হল পেন্সিল, 'ও বোধ হয় এদেশের লোক নয়।'

কিন্তু কেন জানি, ভারি খুশি হয়ে উঠল সর্বকর্মা, নিজের স্প্রীঙগুলোকে পর্যন্ত ঝনঝনিয়ে তুললে সে:

'না-না, সব ঠিক-ঠাক বলছে। সাবাস ছেলে! বেশ বুঝতে পারছি, প্রুতিক আমাদের ভারি বুদ্ধিমান। তাড়াতাড়ি ওকে কথা বলা শেখানো দরকার। নিজেই আমি শেখাব! আমার সঙ্গে সঙ্গে কথা বলতো প্রুতিক, নে বল — বা-বা।'

'বা-বা।' বললে প্রুতিক।

'আরে, কী আশ্চর্য বুদ্ধিমান ছেলে!' উল্লসিত হয়ে উঠল সর্বকর্মা।

'বুদ্ধিমান ছেলে।' পুনরুক্তি করলে প্রুতিয়া।

'আগে ওকে চান করানো দরকার, খাওয়ানো দরকার,' অসন্তুষ্টের মতো বললে পেন্সিল, 'কথা বলা শেখানো পরেও চলবে। নে, আয় প্রুতিয়া, দ্যাখ আমি কেমন গা ধুই।'

তুলতুলে তোয়ালে আনলে ছোট্ট পটুয়া, কুয়ো থেকে জল তুলে আনলে বালতি ভরে, ঠাণ্ডা ঝকমকে জল ছিটিয়ে মজা করে গা ধুতে লাগল (যাদুকররাও গা ধোয় বৈকি)।

'ছ্যোঃ!' গা কুঁকড়ে ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল সর্বকর্মা, 'কী বিদিকিচ্চিরি অভ্যেস!'

তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ ওস্তাদ সর্বকর্মার বড়ো ভয় জলে।

'বিদি-কিচ-চি-রি অভ্যেস!' পুনরুক্তি করলে প্রুতিয়া। পেন্সিল চটে উঠল।

'ছেলেটাকে তুই নষ্ট করছিস! কী শিক্ষা দিচ্ছিস ওকে?'

'যত ঢং!' গজগজ করলে সর্বকর্মা। 'কথা বলাও চলবে না বুঝি!'

অধ্যায় এগারো

আইসক্রীম, গরম দিন, আর সত্যিকারের বরফ

প্রথমে প্রুতিক বায়না ধরলে গা ধোবে না, পরে বললে দুধ খাবে না।

'রোজ সকালে যদি গা-মুখ না ধোস, দুধ না খাস,' শাসালে সর্বকর্মা, 'তাহলে তোকে জাহাজ বানিয়ে দেব না।'

সঙ্গে সঙ্গেই দুধ খেয়ে নিলে প্রুতিক, খেলে লালচে রুটি।

যা যা দরকার সমস্ত যন্ত্রপাতি সর্বকর্মার জন্যে তৈরি করতে লাগল পেনসিল। আর যতক্ষণ সে আঁকছিল, একগুঁয়ে সর্বকর্মা ততক্ষণ কথা বলা শেখাচ্ছিল প্রুতিককে।

'বল, মোটর।'

'মো-টর,' বললে খোকন।

'বল, বাতি।'

'বা-তি।'

'ভারি বুদ্ধিমান ছেলে তুই,' বাহবা দিলে সর্বকর্মা।

'আমি খুব বুদ্ধিমান ছেলে।'

'তাহলে বল, হেলিকপ্টার।'

'হেলি-ক-প্টার।'

'চমৎকার!' খুশি হয়ে উঠল মাস্টার, 'সবচেয়ে ভালো ভালো সব কথা তোকে আজ শিখিয়ে দেব।'

কিন্তু মিনিট কয়েক যেতেই প্রুতিকের বেজার লাগতে লাগল। 'ভেণ্টিলেটরের' বদলে বললে 'ভের্টিলেটর', 'বেলচার' জায়গায় 'কালচে'।

'তুই ওকে বড়ো যন্ত্রণা দিচ্ছিস।' বাধা দিলে পেনসিল, 'সবকিছুই অমন একদিনের মধ্যে শেখানো যায় না। সব ও গুলিয়ে ফেলছে।'

'বাঃ!' রাগ করলে মাস্টার, 'আমায় ভার দিয়ে নিজে তুই কী করছিস। ছেলে মানুষ করায় বাধা দিচ্ছিস। ভালো চাস তো শোন...'

'আগে তুই অমনি একটা ছেলে আঁক, তারপর আমায় শোনাতে আসিস,' বাধা দিলে পেনসিল, 'ওর এতক্ষণে মাথা ধরে গেছে।'

'মাথা ধরে গেছে,' সানন্দেই পুনরুক্তি করলে খোকন।

তখন পেনসিল আর সর্বকর্মা ছেলেটার কাছে এসে তার মাথা টেপাটেপি করে হায় হায় জুড়লে।

'স্রেফ ওর গরম লাগছে,' বললে সর্বকর্মা।

'গরম লাগছে,' বললে খোকন।

'কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে,' ব্যস্ত হয়ে উঠল সর্বকর্মা।

'আমি বরফ এঁকে দিচ্ছি। গা জুড়বে ছেলেটার।' প্রস্তাব দিলে পটুয়া।

তবে গরম সত্যিই খুব পড়েছিল। নির্গন্ধ হয়ে উঠল বুলভারের ফুলগুলো। গ্রীষ্মের সূর্যে রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি এমন তেতে উঠেছিল যে শহরের সমস্ত জানলা ঝিকমিক করছিল ধিকিধিকি ছটায়। জল ছিটানোর গাড়িগুলো শহরময় ছোটাছুটি করে ভিজিয়ে দিচ্ছিল রাস্তা, ফুটপাথ, ঘাস, গাছপালা, এমন কি বাচ্চা ছেলেগুলোকেও। বড়োরা কেন জানি, দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল তা দেখে।

গরম হয়ে উঠেছিল সর্বকর্মাও, লোহায় তৈরি তো।

'তুই একেবারে ইস্ত্রির মতো গরম হয়ে উঠেছিস,' সবুজ ঘাসের ওপর শাদা বরফ এঁকে বললে পেনসিল।

'অবাক কাণ্ড! অবাক কাণ্ড! আরে দ্যাখ! দ্যাখ! বরফ!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল বুলভারের ছেলেপিলেরা, 'সত্যিকারের বরফ!'

'অবিশ্বাস্য ব্যাপার!' বললে পথচারীরা, 'সত্যিই যে বরফ! একেবারে অলৌকিক!'

পড়ে আছে ধবধবে পরিষ্কার স্বচ্ছ শাদা আর ভারি ঠাণ্ডা বরফ। অথচ পাশেই মর্মর তুলছে গাছের সবুজ পাতা, ফুল-ভুঁইয়ে জ্বলজ্বল করছে ফুলের আগুন। গরমে হাঁসফাঁস করছে লোকে, হাওয়া খাচ্ছে রুমাল বা খবরের কাগজ নেড়ে।

এগিয়ে এল এক মাসি, মাথায় শাদা রুমাল, গায়ে শাদা আলখাল্লা, কাঁধ থেকে ঝুলছে বেল্টে বাঁধা শাদা বাক্স। বরফটা চেয়ে দেখলে সে, তারপর আহ্লাদে আটখানা হয়ে চাইলে পেনসিলের দিকে।

'কোথা থেকে তুই জোগাড় করলি? এমন সৌভাগ্য। আমার আইসক্রীম ওদিকে গলতে শুরু করেছে। বরফ ফুরিয়ে গেছে দোকানে। ভাবলাম, সেরেছে। আইসক্রীমগুলোর দফা শেষ। হঠাৎ শুনি সবাই চ্যাঁচাচ্ছে — বরফ! বরফ!'

টাটকা মুড়মুড়ে তুষার-কণার ওপর বাক্সটা নামালে সে, তারপর ঘেমে-ওঠা রুপোলী কাগজে মোড়া 'এস্কিমো' আইসক্রীম দিলে পেন্সিল, সর্বকর্মা আর প্রুতিককে।

'নে বাছা নে, লজ্জা কীসের...'

বুঝতেই পারছ, মেয়েটি আইসক্রীম বেচে।

কেউ যদি সে সময় ওকে থামিয়ে বলত কাঠিতে লাগানো ওই আইসক্রীম কী দুর্ভোগ ঘটাবে পেন্সিল আর সর্বকর্মার, তাহলে হাসিখুশি ওই মাসি কখনো প্রাণ গেলেও আইসক্রীম দিত না ওদের।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সে কথা কেউ ওকে বলে নি, পেন্সিলও এক নিমেষেই আইসক্রীম খেয়ে কাঠিটা চাটতে লাগল।

অধ্যায় বারো

জানলা ভাঙা (ভেনিয়া কাশকিনের দুষ্কর্ম)

ভেনিয়া কাশকিনও এসেছিল বুলভারে। তার পেছু পেছু হাতে খেলনা রিভলবার আর কোমরে কাঠের তরোয়াল নিয়ে একদল ছেলে। সঙ্গে সঙ্গেই সত্যিকারের তুষারের গোলা ঝলকাল বাতাসে।

ভেনিয়া কাশকিনের দলের ছেলেরা বরফের ঢিল ছুড়তে লাগল: ধুপ! ধাপ!

'কী দস্যি ছেলে সব!' চেঁচিয়ে উঠল পথ-চলতি এক বুড়ি। কার একটা বরফের ঢেলা পড়েছিল তার পিঠে। 'কী হচ্ছে এ সব?'

পেন্সিল ভেবেছিল জিজ্ঞেস করবে ওরা সবাই দস্যি নাকি? কিন্তু খোঁচা খোঁচা বরফে তার মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

'যাচ্ছে তাই ব্যাপার!' রেগে উঠল পথচারীরা, 'এ লড়াই এক্ষুনি থামানো দরকার।'

'চল, চলে যাই এখান থেকে,' রুমালে গলা মুছে বললে পেন্সিল, কেননা বরফ পড়েছিল ওর কলারের কাছে।

প্রুতিকের কিন্তু যাবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। তুষারের গোলা পাকিয়ে সে ছুটে যাচ্ছিল ছেলেগুলোর কাছে, তবে ঠিক সময়েই সর্বকর্মা চেপে ধরলে ওর জামা।

'বাড়ি যাব না, যাব না!' চ্যাঁচালে প্রুতিক।

হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলে সে, অধৈর্যে ছটফট করলে, লড়াকু চোখ মেলে চেয়ে দেখলে ছেলেগুলোর দিকে, কিন্তু সর্বকর্মা ওকে ছাড়লে না।

'যাস নে ওদের কাছে। সুশিক্ষা ওখানে কিছু হবে না।' বললে সর্বকর্মা, 'এখন বরং জাহাজ বানানো যাক।'

বুঝতেই পারছ, 'জাহাজ' কথাটি শোনা মাত্তর প্রুতিকের ছটফটানি থেমে গেল, যদিও তুষার-যুদ্ধ তখন তুঙ্গে উঠেছে।

তুষারের নতুন একটা দলা পাকিয়ে ছুড়লে ভেনিয়া কাশকিন।

'ঝুপ! দুম!.. ঝনাৎ!'

ঢেলা গিয়ে পড়ল কাছের একটা বাড়ির জানলায়।

'ঝন! ঝন! ঝন!'

শার্সি ভেঙে পড়ল ফুটপাথে।

'হল তো! বখাটে ছেলে!' জানলায় শোনা গেল ক্রুদ্ধ কার কণ্ঠস্বর, 'জানতাম এই হবে। তোকে যে আগেই বলে রেখেছিলাম। অন্যদের ছেলেরা কেমন সভ্যভব্য, আর এটা কেবল যুদ্ধের বই পড়েছে, ডাকাতের মতো ছুটছে পিস্তল নিয়ে, রাতদিন কেবল যুদ্ধ করে ঘেড়াচ্ছে। আর কোনো কাজ নেই, পড়াশুনা নেই। অকম্মার ঢেঁকি।'

দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল ক্রুদ্ধ জানলাটা। শুধু অক্ষত শার্সিটা বিরক্তিতে শব্দ করলে: 'ঝনঝন!'

অধ্যায় তের

প্রুতিকের হারিয়ে যাওয়া

প্রুতিককে বাড়ি নিয়ে এল সর্বকর্মা, পেনসিলের আঁকা যন্ত্রপাতি নিয়ে বসল জাহাজ বানাতে।

সত্যিকারের রেঁদা দিয়ে সে কাঠ ঘসলে, সত্যিকারের করাত দিয়ে তা কাটলে, কুঁদলে, ঠুকলে, আর গুণগুণ করলে তার পেয়ারের গানটা:

সবই বানাই নিজে নিজে,
বিশ্বাস নেই আজব চিজে!
নিজে নিজে! সবই নিজে!

'নিজে নিজে! সবই নিজে!' ধুয়া ধরলে প্রুতিক।

টেবিলের ওপর ইস্ক্রুপ, বল্টু, চাকা আর দরকারী সব স্প্রীঙ ছড়িয়ে কাজ চালালে সর্বকর্মা। ছোট্ট একটা ইঞ্জিন বেছে নিলে জাহাজের জন্যে।

'বাহবা!' মাথা নাড়লে পেনসিল। আস্তে আস্তে জাহাজটা কেমন বেড়ে উঠছে দেখে অবাক লাগছিল তার।

জাহাজের খোলে ইঞ্জিন ঢোকালে সর্বকর্মা, ডেক বানালে, মাস্তুল খাড়া করলে, তারপর প্রপেলার লাগিয়ে বললে:

'হয়ে গেছে!'

ভারি সুন্দর হল জাহাজটি। সটান দুটি মাস্তুল, তাতে দড়ির মই, গলুইয়ে হাল, ডেকে লাইফ-বোট, খোলা গবাক্ষের কেবিন, ক্যাপটেনের মঞ্চ, সবই আছে তাতে। সরু শেকলে লটকানো মাছ-ধরার বড়শির আকারে ঝকমকে নোঙর।

'সত্যিকারের তুই যাদুকর!' তারিফ করলে পেনসিল, 'কিছুতেই আমার এ রকমটি হত না।'

'যাদুকর! যাদুকর!' সর্বকর্মাকে ঘিরে লাফাতে লাফাতে বললে খোকন, 'দাও আমায় জাহাজ! জলে ছাড়ব!'

'ফের গিয়ে জল ঘাঁটবি?' ভুরু কোঁচকালে সর্বকর্মা, 'না, জলে নামিস নে!'

'আমি যাব ওর সঙ্গে,' বললে পেনসিল, 'জলে আমার ভয় নেই।'

'যাও-না, যাও!' মনে মনে ভাবলে সেয়ানা সর্বকর্মা, 'জল কোথাও নেই। সব শুকিয়ে গেছে অনেক আগেই।'

জাহাজ নিয়ে বেরুল পেনসিল আর প্রুতিক, গান ধরলে:

বিশ্বাস নেই আজব চিজে!
নিজে নিজে! সবই নিজে!

'আইসক্রীম! কুলপি বরফ!' শাদা পোষাক পরা মেয়েরা হাঁকছিল রাস্তায়। 'দশ কোপেক, পনের কোপেক! আমাদের আইসক্রীম কেকের চেয়েও খাশা!'

আইসক্রীম কথাটা শুনেই ছোট্ট পটুয়ার গা শিউরে উঠল, গতি কমে এল। নিশ্বাস ফেলে সে আপন মনে বললে, 'যাদুকরী উনি! আইসক্রীম দিয়েছিলেন আমায়। আইসক্রীমের চেয়ে মিষ্টি দুনিয়ায় আর কিছুই নেই...'

পেনসিলের কানেই গেল না যে কাছেই রেডিওতে গমগমে বাজনা বাজছে, সজোরে ঘোষণা হচ্ছে:

'শোনো! শোনো! চিড়িয়াখানার বড়ো মরাল সরোবরে জাহাজের মডেলের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আধ-ঘণ্টার মধ্যে। প্রতিযোগীরা সবাই পুকুরে চলে এসো।'

'আহ্, কী যাদুই জানে মেয়েটি।' আপন মনে বলছিল পেনসিল, খেয়ালই ছিল না পুতিক কখন পৌঁছিয়ে পড়েছে।

হাতে জাহাজ নিয়ে ছেলের পাল হাঁটছিল রাস্তা দিয়ে। পুতিককে দেখে তারা বললে:

'আরে দ্যাখ, দ্যাখ। কেমন সুন্দর ওর জাহাজ! এই, চলে আয় আমাদের সঙ্গে।'

ছেলেদের সঙ্গে পুতিক ছুটে গেল রাস্তার অন্য ধারে, পাথরের দুটি সিংহমূর্তির পাহারায় মস্তো একটা লোহার ফটক সেখানে। ফটকের ওপর রোদে ঝলমল করছে বড়ো বড়ো হরফ:

চিড়িয়াখানা

জীবন্ত হাতি!

দাঁতালো কুমির!

হিংস্র বাঘ!

বুনো সিংহ!

বিষাক্ত সাপ!

ছেলেপিলেরা এসে দেখে যাও!

টিকিট — দশ কোপেক।

জাহাজ নিয়ে এলে ছেলেপিলেদের
আজ টিকিট লাগবে না!

ফুর্তি-ফুর্তি ফটকটা দিয়ে পুতিক ঢুকে গেল লাফাতে লাফাতে। কেন জানি সমস্ত বাচ্চাই চিড়িয়াখানায় যাবার সময় একটু লাফিয়ে নেয়।

অধ্যায় চোদ্দ

প্রতিক নিখোঁজ

'যাঃ!' সম্বিৎ ফিরল পেন্সিলের, 'প্রতিক, কোথায় তুই? ফের আবার হারিয়ে গেলি নাকি?'

রাস্তা দিয়ে ছোটাছুটি করলে সে, পথচারীদের থামালে: 'প্রতিককে দেখেন নি?' সবাই তারা কাঁধ ঝাঁকালে। কেউ দেখে নি।

একেবারে দিশেহারা হয়ে বাড়ি ফিরল ক্ষুদে পটুয়া।

'প্রতিক আসে নি?' জিজ্ঞেস করলে সে চৌকাট থেকে।

'এ কী কাণ্ড বাধিয়েছিস?' কেঁপে উঠল সর্বকর্মা, 'প্রতিক কোথায়? না, তোর হাতে ছেলে দিয়ে ভরসা নেই।'

দুজনেই ছুটে এল রাস্তায়, কিন্তু কোথায় প্রতিক, সে কি আর ওরা ঠাওর করতে পারে?

জাহাজ হাতে ছেলেপিলেরা আসছিল উল্টো দিক থেকে। যাচ্ছিল তারা পাথুরে সিংহের ফুর্তি-ফুর্তি ফটকটায়।

'জাহাজ হাতে একটা ছেলেকে দ্যাখো নি তোমরা?'

'জাহাজ নিয়ে সব ছেলেই আজ যাচ্ছে প্রতিযোগিতায়,' বললে তারা। 'শীগগিরই শুরু হচ্ছে।'

'সত্যিই হয়তো ও প্রতিযোগিতায় গিয়ে জুটেছে,' ভাবলে সর্বকর্মা আর পেন্সিল।

কিন্তু ফুর্তি-ফুর্তি ফটকটা দিয়ে ঢোকা তেমন সহজ হল না।

'তোমাদের জাহাজ নেই? টিকিটও নেই?' ঢোকার মুখে জিজ্ঞেস করলে গুঁপো টিকিট চেকার, 'গিয়ে কিনে আনো গে।'

'টিকিট কেনার পয়সা আমাদের নেই,' বলতে গিয়েছিল সর্বকর্মা, কিন্তু কিছুই বললে না। টিকিট ঘরের জানলাটার দিকে চাইল সে। অচেনা এক মাসি সেখানে বসে আছে, নীল নীল টিকিট কাটছে কাঁচি দিয়ে। গুমোট লাগছিল তার।

'উহ্, কী গরম!' নিশ্বাস ফেললে মাসি।

মাথা চুলকালে সর্বকর্মা। কিছু একটা ভাবনা খেললে অনেকে ওটা করে।

'হয়েছে,' বললে ও তার মিইয়ে পড়া বন্ধুকে, 'দুটো আইসক্রীম এঁকে দে!'

চটপট আইসক্রীম আঁকলে পেন্সিল। তবে কেন জানি ভুল করে সে দুটোর বদলে আঁকলে তিনটে। সর্বকর্মা অবিশ্যি ভুলটা ধরতে পারে নি। পেন্সিলের কাছ থেকে

দুটো আইসক্রীম নিয়ে সে গেল জানলাটার কাছে, তৃতীয়টি গলাধঃকরণ করলে পেন্সিল।

'মাসি, আপনার গরম লাগছে? দুটি আইসক্রীম এনেছি আপনার জন্যে, এই নিন!'

'আহা, লক্ষ্মী ছেলে!' চঞ্চল হয়ে উঠল মাসি, 'কী বাহাদুর! এই নে দুটো টিকিট। আহ কী মিষ্টি!'

বন্ধ হয়ে গেল জানলা। তার ওপর দেখা দিল একটা ফলক, তাতে লেখা আছে:

বন্ধ: পাঁচমিনিট ইণ্টারভ্যাল

প্রুতিয়াকে খোঁজার জন্যে ছুটছিল পেন্সিল আর সর্বকর্মা। চিড়িয়াখানার ফটকের কাছে এল ভোনিয়া কার্শাকিন, রাগী-রাগী মুখ, মেজাজ খারাপ।

টিকিট কেনার পয়সা তার ছিল না। নিশ্চয় তোমাদের মনে আছে যে জানলার শার্সি ভেঙে দিয়েছিল সে। কেন জানি বরাবরই তাই হয়। জানলার কাঁচ ভেঙে ফেললে আইসক্রীম কি সিনেমা, কি চিড়িয়াখানার জন্যে একটি পয়সাও কেউ দেয় না। ভারি ওর ইচ্ছে হচ্ছিল যে করে হোক ফুর্তি-ফুর্তি ফটকটা পেরয়, জাহাজের প্রতিযোগিতা দেখে। কিন্তু নিজের জাহাজ ভোনিয়ার ছিল না। ঘোরতর অবস্থা। টিকিটও নেই, জাহাজও নেই।

ভুরু কুঁচকে ছেলেগুলোর দিকে চেয়েছিল ভোনিয়া, হঠাৎ এক চেনা ছেলে চোখে পড়ল তার — ছোট্ট তিমা। তিমার এক হাতে তার নিজের বানানো জাহাজ।

'এই তিমা!' কড়া গলায় হাঁকল কার্শাকিন, 'তোর জাহাজটা আমায় দে তো! চটপট! তুই পুঁচকে, বিনা টিকিটেই তোকে ঢুকতে দেবে?'

'দেব না!' নির্ভয়ে জানিয়ে দিলে তিমা।

'কী বললি?!' খেঁকিয়ে উঠল ভোনিয়া কার্শাকিন, 'এমন গাঁট্টা লাগাব, দেখবি?'

'বাবাকে বলে দেব!' বললে তিমা, 'ঐ দ্যাখ, টিকিট কিনছে।'

ওদের কাছে এল তিমার বাবা।

'কী চাই এই ডার্নাপিটেটার?'

হঠাৎ ভারি ভালোমানুষের মতো মুখ করলে ভোনিয়া, ঘিনঘিনে গলায় বললে:

'আমি ঠাট্টা করছিলাম — হি-হি!.. আর ও ভাবলে বুঝি সত্যি। হে-হে! ঠাট্টা করছিলাম।'

হাঁ হয়ে ভোনিয়াকে দেখছিল তিমার বাবা, কেমন হতবুদ্ধির মতো নিজের মনেই বললে:

'জানতামই না ছোঁড়াটা দু'রকম গলায় কথা কইতে পারে। নাহ্, সত্যিই হয়তো ও কোনো ছেলের ওপর হামলা করে জাহাজ ছিনিয়ে নেবে। বরং আমাদের সঙ্গেই চলুক। যেতে দিন ওকে,' টিকিট কালেক্টরকে বললে বাবা, 'এই নিন টিকিট!'

অধ্যায় পনের

হাতি, বাঘ, সিংহশিশু আর পাল-তোলা জাহাজ

'গেল কোথায় প্রুতিয়া?' চিড়িয়াখানায় ছোটাছুটি করে অস্থির হয়ে উঠল আমাদের দুই বন্ধু, 'অবাধ্য ছেলে, কোনো বুনো জন্তুর খাঁচায় গিয়ে সেঁধয় নি তো?'

প্রতিটি বেড়ার কাছে দাঁড়াল সর্বকর্মা আর পেন্সিল, উঁকি দিলে প্রতিটি খাঁচায়।

দেখলে সবুজ জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড এক হাতি, ছাই রঙের শুঁড় দোলাচ্ছে। যেন বলতে চাইছে, 'নমস্কার! আমি খুব বড়ো। সবচেয়ে বড়োরা কখনো কারুরই ক্ষতি করে না।' কিন্তু হাতির কাছে পাওয়া গেল না প্রুতিয়াকে।

ডোরাকাটা বাঘ তো তাদের লক্ষই করলে না। খাঁচার মধ্যে ক্রমাগত সে পাক খাচ্ছিল আর ভাবছিল, 'লোকে বলে আমি নাকি বেড়ালের মতো দেখতে। মিথ্যে কথা। আমি হলুম — হালুম! ইঁদুরে আমার রুচি নেই!'

শূন্যি মাঠে ধরা পড়া প্রকাণ্ড সিংহ তার শূন্যি খাঁচাটায় একলাটি মনমরার মতো শুয়ে ছিল থাবায় মাথা নামিয়ে।

'বেচারি!' বললে সর্বকর্মা, 'ভারি কষ্টে আছে ও। ইচ্ছে হচ্ছে গায়ে ওর একটু হাত বুলিয়ে দিই।'

পেন্সিলেরও ভারি মায়া হল নিঃসঙ্গ সিংহটার জন্যে। অনেক ভেবেচিন্তে সে এঁকে দিলে ছোট্ট এক সিংহ-ছানা। এমন ছোট্ট, যেন সত্যিকারের এক বেড়াল।

খাঁচার শিক গলে ভেতরে ঢুকে গেল ছানাটা। সিংহও খুশি হয়ে উঠল খুব: বাচ্চাদের পেয়ে সর্বদাই তো একলা মানুষদের মন ভরে ওঠে আনন্দে।

'এইবার! এইবার!' শোনা গেল মাইকে, 'বড়ো মরাল সরোবরে শুরু হচ্ছে জাহাজের মস্তো প্রতিযোগিতা। কিশোর মিস্ত্রিরা, জলদি!'

চিড়িয়াখানার হাঁটা-পথে দেখা দিল ভেনিয়া কাশকিন, ছোট্ট তিমা আর তিমার বাবা।

'দেরি হয়ে যাবে আমাদের,' বললে বাবা।

তিমার হাতে কাঠের এক জাহাজ, — জাহাজ-বিদ্যার সমস্ত ওস্তাদি দিয়ে তা বানানো। আর সর্বকর্মাও একজন ওস্তাদ, তাই পাইনকাঠের চমৎকার জাহাজটিকে সে লক্ষ না করে পারল না। হ্যাঁ, পাইনকাঠেরই বটে। জাহাজের গা-খানা গোটাটাই এক সাধারণ পাইনকাঠের তক্তা। তাতে একটা কাঠি গোঁজা — সেটা মাস্তুল। মাস্তুলে চৌকো একটা কাগজের পাল।

জাহাজের গায়ে নীল পেন্সিলে লেখা: 'তিমা'।

'এই খোকা,' সমাদর করে জিজ্ঞেস করলে সর্বকর্মা, 'চমৎকার এই জাহাজটা কে বানিয়েছে রে?'

'কেউ না, নিজেই আমি ছুরি দিয়ে কুঁদে নিয়েছি।'

'জাহাজের নাম তাহলে কেন "তিমা"?'

'আমি তিমা,' গুরুত্ব ফলিয়ে বললে সে।

সর্বকর্মার ইচ্ছে হয়েছিল জাহাজটার তারিফ করবে, কিন্তু ততক্ষণে প্রকাণ্ড এক গোল দীঘির কাছে এসে পড়েছিল তারা।

পাড়ে তার লোক জমেছে। চারিদিক থেকে আসছে ছেলেপিলেরা, ছোটাছুটি করছে। মাথার ওপর উড়ছে সত্যিকারের এক জাহাজী পতাকা। কুচকাওয়াজের বাজনা বাজছে। ঠিক একেবারে জলের কাছেই গড়া এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে শাদা টুপি পরা সত্যিকারের এক জাহাজী ক্যাপটেন। সত্যিকারের জাহাজী দূরবীন দিয়ে সে তাকিয়ে আছে দীঘির জলে, যেন সত্যিকারের জাহাজ ভাসছে সেখানে, সত্যিকারের ঢেউ উঠেছে, আর সে ঢেউকে ক্যাপটেন এতটুকু ডরায় না।

কিন্তু ছেলেপিলেদের যা ভিড়, তার পেছন থেকে জাহাজ বা ঢেউ কিছুই চোখে পড়ছিল না তিমা বা সর্বকর্মার।

'আরে, এ ছেলেটারও যে জাহাজ রয়েছে। নিজের বানানো জাহাজ।' কাছেই দাঁড়ানো এক ভদ্রলোক দেখালে তিমার দিকে, 'ওকে পথ করে দিন, ভাই সব। প্রতিযোগিতায় এসেছে ছেলেটা।'

'পথ করে দিন! পথ করে দিন!' সমস্বরে চেঁচাল সব, 'পথ দিন ছেলেটাকে!'

পথ পেতেই জাহাজ হাতে তিমা আর তার পেছু পেছু বাবা, সর্বকর্মা আর ভেনিয়া কাশকিন গিয়ে পেঁছিল একেবারে জলের ধারটিতে।

নীল জলের ওপর ইয়া-ইয়া জাহাজ। চিমনিওয়ালা জাহাজ, বরফভাঙা জাহাজ, ডুবো-জাহাজ; পাল-তোলা জাহাজ তো পুরো এক নৌবহর। পাল পতপত করছে

12

বাতাসে, কিন্তু সত্যিকারের রিবণ-রূপী কাছিতে শক্ত করে বাঁধা থাকায় জাহাজ নড়ছিল না।

ছেলেপিলেরা সবাই মুগ্ধের মতো তাকিয়ে ছিল পাল-তোলা জাহাজগুলোর দিকে। এই বুঝি সেখানে দেখা দেবে দুঃসাহসী ক্যাপটেন, জলদ-গম্ভীর গলায় হুকুম দেবে:

'নোঙর তোলো!'

বাতাসে ফুলে উঠবে পাল, একেবারে কোন দূরের দেশে ভেসে যাবে জাহাজ। সমুদ্রের ওপর সেখানে উড়ে বেড়ায় শাদা শাদা সিন্ধুচিল, ঢেউ আছড়ে পড়ে জনহীন দ্বীপের ওপর।

স্টীম ইঞ্জিনের জাহাজগুলোও অবিশ্যি সমুদ্র পাড়ি দেয়, ঢেউ ভাঙে, লোকজনকে নিয়ে যায় নানান সব শহরে। কিন্তু কেন জানি, জনহীন দ্বীপে তা কখনো পৌঁছয় না। পাল-তোলা জাহাজ কিন্তু ভেসে যাবে কোথাকার কোন দূরের সমুদ্রে। প্রতিটি শিশুই সেখানে পেয়ে যাবে জনহীন এক-একটা দ্বীপ। কোনো বাষ্পীয় পোতেরই সেখানে যাবার সাধ্যি নেই।

সেই জন্যেই দুনিয়ার দুঃসাহসী ছেলেরা সবাই শাদা পালের অমন ভক্ত।

'নোঙর তোলো!' সজোরে হুকুম দিলে মঞ্চে দাঁড়ানো ক্যাপটেন। একেবারে সত্যিকারের, বয়স্ক, জাহাজী ক্যাপটেন।

বয়স্করাও পাল-তোলা জাহাজ ভালোবাসে বৈকি।

অধ্যায় ষোলো

সর্বকর্মার জয়জয়কার

ক্যাপটেন হুকুম দিতেই কাছি খুলে দিলে ছেলেরা।

গুঞ্জন করে উঠল ইঞ্জিন, কেঁপে উঠল জাহাজ, দীঘির শান্ত জলের ওপর দিয়ে তারা যাত্রা করল অপর পাড়ের দিকে। আস্তিনে লাল ফিতে বাঁধা সব বয়স্ক লোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। ঘড়ি দেখছিল তারা, কোন জাহাজ সবচেয়ে আগে আসে।

'ধুর! ধুর!' নিশ্বাস ফেললে ভেনিয়া কাশকিন, 'কখনো যদি যাদুকর হতে পারি,

তাহলে পাল-তোলা একটা জাহাজকে ফুসমন্ত্রে বড়ো করে নেব, চলে যাব মহাসাগরে... হুকুম দেব: বাঁয়ে হাল! ডাইনে হাল!'

'মহাসাগরে পাড়ি দেওয়া খুবই ভালো কথা,' বললে তিমার বাবা, 'তবে তার জন্যে চাই সাহস, নির্ভীকতা, উদারতা।'

'সাহস আমার আছে,' বললে ভেনিয়া।

'নে, থাম,' ভালো মনেই বললে বাবা, 'তুই দেখছি এক বাক্যবীর। আগে ওই অমনি একটা জাহাজ বানাবার চেষ্টা করে দ্যাখ না।'

'ফুঃ!' বললে ভেনিয়া কাশকিন, 'ও জাহাজ তো দোকানেও কিনতে পারা যায়। আমি চাই সত্যিকারের জাহাজ!'

'বটে?! কিছুই করার তো ইচ্ছে নেই।' বললে বাবা, 'নিশ্চয়, তুই ভারি আলসে?'

'আলসে? কে সে?' জিজ্ঞেস করলে পাশেই দাঁড়ানো একজন লোক।

'কোথায় সে?' ভেনিয়া কাশকিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা শুরু করল সবাই, 'আলসে কেমন একটু দেখি তো। আমাদের শহরে আলসে তো কেউ আর নেই। অনেক দিন থেকেই তাদের আর দেখা যায় না।'

'আরে কী বলছেন আপনারা!' তাড়াতাড়ি সবাইকে শান্ত করতে চাইল তিমার বাবা, 'ভুল শুনেছেন। এ ছেলেটা মোটেই আলসে নয়। বই-টই নিশ্চয় পড়ে। কী বই তুই পড়িস বল তো?' জিজ্ঞেস করলে সে ভেনিয়াকে।

'যুদ্ধ, গুপ্তচর, জলদস্যুর বই!' বড়াই করলে ভেনিয়া।

'তবু ভালো,' কেন জানি নিশ্বাস ফেললে বাবা।

'আরে দ্যাখো, দ্যাখো,' বললে তিমা, 'কার একটা জাহাজ সবাইকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

'এটা আমার জাহাজ!' খুশি হয়ে উঠল সর্বকর্মা, 'তার মানে প্রুতিক এখানেই আছে।'

'আপনার জাহাজ?' জিজ্ঞেস করলে পাশে দাঁড়ানো লোকটা।

'আমার! আমার!' বললে লোহার মানুষটি, চারপাশের সবাই তার দিকে তাকাতে লাগল সম্ভ্রম করে।

'আপনি সত্যিকারের ওস্তাদ!' বললে তিমার বাবা, 'আসুন, আপনার সঙ্গে করমর্দন করি!'

সর্বকর্মার জাহাজখানা তীরবেগে ছুটছিল ওপারের দিকে। ঝকমকে দশাসই বাষ্পীয় পোত, বরফভাঙা জাহাজ, ডুবো-জাহাজগুলোকে ছাড়িয়ে গেল তা। সবচেয়ে দ্রুত-গামী জেট জাহাজগুলোর পাল্লাও সে প্রায় ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু পাল-তোলা ফ্রিগেট, পানসী, বাইচ নৌকোগুলোর ভিড়ে সে পথ পাচ্ছিল না। হঠাৎ তখন জাহাজটা তার গতিমুখ বদলালে। মনে হবে যেন তার ভেতরে বুঝি বসে আছে ক্ষুদে ক্ষুদে মাঝি-মাল্লা, সারেং, ক্যাপটেন। পাল-তোলা নৌবহরকে ঘুরে গিয়ে জাহাজটা ঢেউয়ের ওপর খানিক দুলে সোজা ছুটল রকেট জাহাজগুলোকে লক্ষ্য করে।

কের্বাল, কের্বাল কাছিয়ে আসতে লাগল তা।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই পেছনে পড়ল সমস্ত জাহাজ। জেটিতে ভিড়ল সর্বকর্মার জাহাজই সবার আগে। গতি মন্থর হয়ে এল তার, নিজে নিজেই তা নোঙর ফেলে স্থির হয়ে গেল। জাহাজের প্রথম মাস্তুলে উঠল ছোট্ট একটা পতাকা।

অধ্যায় সতের

প্রতিকের খ্যাতি লাভ

‘কার জাহাজ প্রথম হল?’ বাজখাঁই গলায় জিজ্ঞেস করলে সত্যিকারের জাহাজী ক্যাপটেন।

‘কার জাহাজ? কার? জাহাজটা কে বানিয়েছে বলুন তো?’ সর্বকর্মার কাছ থেকে যারা দূরে দাঁড়িয়েছিল, তারা বলাবলি করছিল এই সব কথা।

মাইকে ঘোষণা হল:

‘পয়লা নম্বর জাহাজটি যে বানিয়েছ, ক্যাপটেনের মঞ্চে উঠে এসো। বিজয়ীকে খেতাব দেওয়া হবে। দামী পুরস্কারও সে পাবে।’

‘লোকের কেমন সব জুটেও যায়!’ গজগজ করলে ভোনিয়া কার্শাকিন।

‘অভিনন্দন জানাই। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি আর আমার ছেলে দুজনেরই খুব আনন্দ হল,’ আরেক বার সর্বকর্মার করমর্দন করলে তিমার বাবা, ‘চলে যান ক্যাপটেনের কাছে, তাড়াতাড়ি করুন, ডাকছে আপনাকে।’

‘ওস্তাদকে যেতে দিন,’ বললে পাশে দাঁড়ানো লোকটা, ‘পথ ছেড়ে দিন ওস্তাদকে।’

এমন আনন্দ সর্বকর্মার আর কখনো হয় নি। ঝকমক করে উঠল লোহার ছোট্ট মানুষটি, জ্বলজ্বল করে উঠল খুশিতে। সবাই পথ ছেড়ে দিচ্ছিল তাকে।

হঠাৎ শোনা গেল কার যেন সরু গলা:

'ওটা আমার জাহাজ! আমার!'

ক্যাপটেনের মঞ্চে ছুটে গেল পেন্সিলের আঁকা খোকন প্রুতিয়া।

'যাক, তাহলে পাওয়া গেল প্রুতিককে!' ঝনঝনিয়ে উঠল ভাগ্যবান সর্বকর্মা।

'আমার জাহাজ,' মঞ্চে দাঁড়িয়ে বললে খোকন, 'দাও আমায় প্রাইজ।'

প্রাইজ ছিল সামনেই। খেলনা, লজেন্স, বিস্কুট আর চকোলেটের মস্তো এক বাহারে বাক্স।

'নাম কী তোর?' জিজ্ঞেস করলে সত্যিকারের জাহাজী ক্যাপটেন, 'উপাধি?'

'প্রুতিয়া পেন্সিলপুত্র।'

'ইশকুলে পড়িস, নাকি এখনো কিন্ডারগার্টেনে? কে তুই?'

'আমি খুব বুদ্ধিমান ছেলে,' বললে প্রুতিক।

'নিজেই তুই জাহাজটা বানিয়েছিস? বিজয়ী বলে তাকেই মানা হবে যে নিজে বানিয়েছে। বুঝেছিস তো? নিজে!'

জ্বলজ্বলে প্রাইজটার দিকে তাকাল খোকন, তারপর ক্যাপটেনের দিকে। বললে:

'আমি নিজেই। নিজেই আমি জাহাজ বানিয়েছি।'

'এই জাহাজটার জন্যে,' সমারোহে ঘোষণা করলে সত্যিকারের জাহাজী ক্যাপটেন, 'তোকে খেতাব দেওয়া হচ্ছে। তুই হলি — কিশোর টেকনিশিয়ান। অভিনন্দন জানাচ্ছি তোকে।'

খোকনের করমর্দন করে সে সেলাম ঠুকলে।

সমারোহে বেজে উঠল কুচকাওয়াজের বাজনা, 'হুররে' বলে চেঁচিয়ে উঠল সব ছেলেপিলে, হাততালি দিতে লাগল। তিমার বাবা সর্বকর্মার দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথা নাড়লে।

'লজ্জা হওয়া উচিত হে ছোকরা,' ধিক্কার দিয়ে বললে সেই পাশে দাঁড়ানো লোকটা, 'পরের যশ মেরে নেবার ফন্দি!'

'অতি অন্যায়!' বলাবলি করলে চারপাশের সবাই।

নিজের স্প্রীঙগুলো দিয়ে করুণভাবে খনখন করলে সর্বকর্মা।

'জোচ্চোর!' দাঁত চেপে বললে ভেনিয়া কাশকিন, 'কষে গালে থাপ্পড় দেওয়া দরকার!'

ক্যাপটেনের মঞ্চ ছেঁকে ধরল যত ফোটোগ্রাফার, সাংবাদিক, সঙ্ঘ-সমিতির লোকজন। সবাই চায় বিজয়ীর সঙ্গে কথা বলতে। শহরের সেরা সিনেমার টিকিট, শিশু রঙমহলের

প্রবেশপত্র সে পেলে বিনামূল্যে। কিশোর টেকনিশিয়ানদের প্রাসাদ থেকে এল তাদের জরুরী ও পূর্ণক্ষমতাধর ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, বিজয়ীকে প্রাসাদে দিনযাপনের আমন্ত্রণ জানাল সে। দু'সপ্তাহের জন্যে!

মঞ্চের ওপর উড়ে এল মস্তো এক হেলিকপ্টার, গায়ে তার জ্বলজ্বলে হরফে লেখা:

বিজয়ীকে অভিনন্দন!

'হেলিকপ্টারে শহর ঘুরে দেখার জন্যে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে প্রুতিয়া পেনসিলপুত্রকে,' বললে হেলিকপ্টারের মাইকে।

দড়ির মই নেমে এল হেলিকপ্টার থেকে। ভাগ্যবান খোকন কিশোর টেকনিশিয়ানকে কোলে নিয়ে সত্যিকারের জাহাজী ক্যাপটেন তাকে তুলে দিলে বৈমানিকদের হাতে।

'প্রুতিয়া, প্রুতিয়া!' করুণ স্বরে ডাকাডাকি করলে সর্বকর্মা, 'আমরা যে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

কিন্তু লোহার মানুষটিকে খোকন দেখতেই পেলে না। প্রুতিককে নিয়ে হেলিকপ্টার উঠে গেল রোদ ঢালা আকাশের উ'চুতে।

'আহ, পেনসিল, কেন যে তুই খোকা আঁকতে গেলি?' বলে নিশ্বাস ফেলল সর্বকর্মা, আর অমনি ঠিক তোমার আমার মতোই তার টনক নড়ে উঠল, 'আরে, পেনসিল গেল কোথায়?'

কোথায় পেনসিল?! একেবারেই ওর কথা মনে ছিল না।

'এই নাও পেনসিল,' বলে ভালো মানুষ তিমা তার পকেট থেকে বার করে দিলে রঙীন নীল পেনসিল।

'এ পেনসিল নয়! সত্যিই হারাল এবার!..'

দুর্ভাবনায় অস্থির সর্বকর্মা ভিড় থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে ছুটল বাঁয়ে, তারপর ডাইনে।

'পেনসিল! পেন-সিল!' ডাকতে লাগল, 'পেনসিল ভাইটি!'

'ঘড়-ঘড়-ঘড়...' শোনা গেল কার যেন করুণ ঘড়ঘড়ানি।

দেখা গেল বাগানের এক চওড়া বেঞ্চিতে বসে আছে পেনসিল।

'ঘড়-ঘড়-ঘড়!' অপরাধীর মতো সাড়া দিলে পেনসিল।

আসলে ও বলতে চেয়েছিল: 'আমি এখানে।'

সামনে তার এক রাশ আইসক্রীমের কাটি।

'লক্ষ্মীছাড়া পেনসিল!' হতাশে চেঁচিয়ে উঠল সর্বকর্মা, 'ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসেছিস! গুচ্ছের আইসক্রীম গিলেছিস! হাঁদারাম কোথাকার! কিন্তু এত আইসক্রীম তোকে দিলে কে?'

'ঘ্রা-ঘ্রিড়-ঘড়,' বললে পেনসিল।

আসলে সে বলতে চেয়েছিল: 'আমি এ'কে নিয়েছিলাম। লোভ সামলাতে পারি নি। আর করব না।' কিন্তু ঠাণ্ডা লেগে গলা ওর বসে গিয়েছিল।

'গরম দুধ খাওয়ানো দরকার ওকে। ঠাণ্ডা লাগলে তাতে কাজ দেয়।' বললে কে একজন পথচারী বুড়ো।

'বাড়ি চল এক্ষুনি অবাধ্য, বেয়াদব, বিটকেলে পেনসিল!' রেগে মাটিতে পা ঠুকে চ্যাঁচাল সর্বকর্মা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাড়ি চলল পেনসিল।

মর্কটগুলো হাসল ওকে দেখে। হাতি মাথা দোলালে: 'ছি-ছি-ছি!'

সিংহটা কিছু খেয়াল করলে না। ছোট্ট সিংহছানার সঙ্গে সে 'বকবকুমকুম পায়রা খাব' খেলা খেলছিল।

পরের দিন এই সিংহশাবক নিয়ে খবরের কাগজে বেরিয়েছিল:

চিড়িয়াখানায় আজব কাণ্ড

সিংহের খাঁচায় কাল একটি সিংহছানা পাওয়া গেছে।
ছানাটি এখনো দুগ্ধপোষ্য, ওজন এক কিলোগ্রাম।
নবজাতকের ওপর বিজ্ঞানীরা দৃষ্টি রেখে যাচ্ছেন।

অধ্যায় আঠারো

লোহার মানুষটি কাঁদো-কাঁদো

পেনসিলকে সর্বকর্মা বাড়ি নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দিলে।

অ্যাম্বুলেন্স ডাকা দরকার, কিন্তু বাড়িতে টেলিফোন ছিল না।

বেচারি পেনসিলের অবস্থা খারাপ দাঁড়াল। অসুখে পড়েছে ক্ষুদে পটুয়া। জ্বরে গা আগুন অথচ ওর মনে হচ্ছিল ঘরটা বেজায় ঠাণ্ডা। শীতে কাঁপুনি ধরল তার, দাঁত ঠকঠক করতে লাগল।

জানলায় পর্দা টেনে দিলে সর্বকর্মা, সবকটি কম্বল, এমন কি বালিশ দিয়েও তাকে চাপা দিলে, কিন্তু কোনো লাভ হল না।

ওদিকে সন্ধ্যা নামল, তারপর রাত। ঘরটা হয়ে গেল একেবারে অন্ধকার আর চুপচাপ। শোনা যাচ্ছিল শুধু পেনসিলের দাঁত ঠকঠকানি।

চুল্লি জ্বালাবার জন্যে শুকনো পাতা কুড়তে বেরুল সর্বকর্মা।

বুলভারে কেউ নেই। সবাই ঘুমতে চলে গেছে অনেকক্ষণ।

'পেনসিলটা একটা গাধা,' ছুটোছুটি করে গজগজ করলে সর্বকর্মা, 'একটা ইলেকট্রিক স্টোভও এ'কে দিতে পারে নি। হাঁদাটা!'

গজগজ করছিল অবশ্য এমনি। খুবই, খুবই কষ্ট হচ্ছিল তার, পাছে কে'দে ফেলে তাই অমন রাগ-রাগ ভান করছিল।

আর অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে ভুল বকছিল পেনসিল। রোগী যখন ভুল বকে তখন তার সব কথাই হয় বেঠিক।

'দুই দুগুণে সাত,' বিড়বিড় করছিল পেনসিল, 'তিন তিরিক্কে পাঁচ, সাত সাতে নয়...'

চৈতন্য ছিল না তার। আর রোগী যখন চৈতন্য হারায়, তখন সে উঠে হে'টে কিছু একটা করতে পারে বটে, তবে সবই বেঠিক।

লেপ বালিশের তল থেকে বেরিয়ে এল পেনসিল, হোঁচট খেতে খেতে দেয়ালের কাছে গিয়ে আঁকতে শুরু করলে ছবি, তবে কী যে আঁকছিল তার কোনো খেয়াল ছিল না...

'সাত সাতে পাঁচ...' ছবি আঁকতে আঁকতেই বিড়বিড় করছিল সে।

হায়রে সর্বকর্মা, কোথায় তুই শীগগির বাড়ি ছুটে আয়! আঁকতে দিস না অসুস্থ পেনসিলকে।

সর্বকর্মা কিন্তু পাতা জোগাড় করেছিল এক গাদা। বহু কষ্টে তা বয়ে আনছিল বাড়িতে। অমন বোঝা নিয়ে কিছুতেই তো আর দৌড়নো যায় না।

দেয়ালে পেনসিল এ'কে দিলে এক ভয়ঙ্কর জলদস্যুর ছবি, কোমরে মস্তো এক বাঁকা ভোজালি, দুটো পিস্তল, হাতে দস্যুদের কালো পতাকা। এ দস্যুকে একবার সে দেখেছিল ডানপিটে ছোঁড়া ভেনিয়া কাশকিনের আঁকা ছবিতে।

ছবির দস্যু চোখ মটকালে পেনসিলকে, কালো ডাকাতে পতাকাটা গুটিয়ে পুরে নিলে প্যান্টের পকেটে।

অসুস্থ পটুয়া কিন্তু কিছুই খেয়াল করলে না। এ'কে দিলে সে কালো মুখোস পরা, কলার তোলা ধুসর রেন-কোট গায়ে সেই গুপ্তচরকে।

তারপর আঁকলে কুকুরের মতো দেখতে কালির ছোপটাকে। ভোনিয়া কাশকিনের ছবিতে যেমন ছিল, সব তেমনি।

দরজায় পাতা খসখস করে ঘরে ঢুকল সর্বকর্মা। বোঝাটা মেঝেয় ফেলে সে শুইয়ে দিলে পেনসিলকে।

রুগী হাত-পা ছুড়ে চেঁচালে:

'দুই দুগুণে পাঁচ! আইসক্রীম দে ভোনিয়া কাশকিনকে! আইসক্রীম দে!..'

আহা, বেচারি, বেচারি পেনসিল!..

সর্বকর্মার নজরেই পড়ল না যে দেয়াল থেকে উঠে আসছে দুটো কালো ছায়া, নিঃশব্দে তারা আধ-খোলা দরজাটা গলে মিলিয়ে গেল বুলভারের অন্ধকার রাতে। আর তাদের পেছু পেছু ছুটল তৃতীয় একটি ছোট্ট ছায়া, দেখতে কুকুরের মতো।

চাপা শব্দ তুললে বুলভারের গাছ। দরজা বন্ধ করে সর্বকর্মা চুল্লি জবালালে। তপ্ত আগুনে আলো হয়ে উঠল ঘর। চুল্লির মধ্যে মুড়মুড়িয়ে পুড়ছিল পাতা, লাফিয়ে উঠছিল শিখা, আলো দপদপ করছিল দেয়ালে।

ঘুমিয়ে পড়ল পেনসিল।

আর চুল্লির সামনে বসে সর্বকর্মা বুকভাঙা নিঃশ্বাস ফেললে:

'বেচারি পেনসিল!'

অধ্যায় উনিশ

রাতের ডাকাত

কেন জানি সে রাতে শহরের আলো জবলে নি। একেবারে ঘুরঘুট্টি রাত। সর্বদাই এমন ঘুরঘুট্টি রাতে কিছু না কিছু ঘটে।

অনেক আগেই শুয়ে পড়েছে লোকেরা, একটি জানলাতেও আলো দেখা যায় না। ঘুমোবার সময় আলোর কী দরকার?

আর এই ঘুরঘুট্টি রাতটিতে রাস্তা দিয়ে ছুটছিল কোথাকার কোন উটকো দুটো ক্ষুদে মানুষ আর কোথাকার কোন উটকো একটা কুকুর। কেবলি ইতি-উতি চাইছিল তারা, বেছে নিচ্ছিল রাস্তার সবচেয়ে অন্ধকার দিকটা, সেঁধচ্ছিল কালো অলিগলিতে।

'ঢঙ-ঢঙ-ঢঙ!' ঘড়ি বাজল শহরের মিনারে।

'ঘেউ-ঘেউ!..' বললে কোথাকার কোন কুকুরটা।

'হুস!' কুকুরটাকে শাসালে কোমরে মস্তো বাঁকা ভোজালি আর দুই পিস্তল ঝোলানো, চ্যাটালো পার্টাকিলে দাড়িওয়ালা কোথাকার কোন লোকটা।

'কো-কোথায় আ-আমরা ছু-ছুটছি দাদা?' জিজ্ঞেস করলে ধূসর রেন-কোট পরা লোকটা। ছুটতে আর সে পারছিল না, দম ফুরিয়ে গিয়েছিল।

'নিশ্চয় পুলিস আমাদের পিছু নিয়েছে,' ভয়ঙ্কর ফিসফিসিয়ে বললে দেড়েল।

'আমার মনে হচ্ছে কেউ পিছু নেয় নি।'

রেন-কোট পরা লোকটা থেমে গেল। থামল দেড়েলও। চারিদিকে চেয়ে দেখলে তারা, কান পেতে শুনলে। কেউ কোথাও নেই।

'আশ্চর্য!' বিস্ময়ের অস্ফুট শব্দ করলে দেড়েল, 'সত্যিই তো কেউ তাড়া করছে না। আমরা দস্যু আর কেউ আমাদের পিছু নেয় নি! বইয়ে তো এমনটা হয় না!'

'আমি দস্যু নই,' আপত্তি করলে রেন-কোট পরা লোকটা, 'সচ্চরিত্র গুপ্তচর আমি। আমার নাম সিঁধেল।'

'ফুঃ!' দুয়ো দিয়ে উঠল দেড়েল, 'দস্যু আর গুপ্তচর একই জিনিস। তুই শুধু সাধারণ ডাকাত, আর আমি সাধারণ নই। আমি হলাম জলদস্যু! বোম্বেটে! ডাকসাইটে ক্যাপটেন টগবগ! সমুদ্রের বিভীষিকা!'

'আপনার সঙ্গে চেনা হয়ে ভারি খুশি হলাম বোম্বেটে মশাই,' বদরাগী সহচরের দিকে আড়চোখে চেয়ে বললে গুপ্তচর সিঁধেল।

ওদের আলাপটা কারো কানে গেলে সে ভাবত বুঝি একজন লোকই কথা কইছে। জলদস্যু আর গুপ্তচরের গলার স্বর একই রকম। দুজনেই ওরা কথা কইছিল ভোনিয়া কাশকিনের মতো গলায়।

অবিশ্যি দুজনের গলার স্বর অবিকল এক তা বলা যায় না। পাড়ার ছেলেগুলোর সঙ্গে কথা কইবার সময় ভোনিয়ার গলার স্বরটা যেমন শোনায়, জলদস্যুর গলা সেই রকম। আর সেই একই ভোনিয়া যখন কারো তোয়াজ করত অথবা মাকে বোঝাত যে মিষ্টিগুলো সে নয়, ইঁদুরে খেয়ে গেছে, তখন তার গলা যে রকম হয়ে উঠত, সেই রকম হল গুপ্তচরের স্বর।

একই লোকের দু'রকম গলা তো হয়।

'গর-র-র!' গজরে উঠল ঝাঁকড়া কুকুরটা। আসলে ও বলতে চেয়েছিল: 'আমার কথা তোমরা ভুলে যাচ্ছ।'

'আরে, এই তো আমাদের বিশ্বস্ত খেঁকুরে কুকুর কেলে-ছোপ। চু-চু, আয় তো দেখি!' ডাকলে জলদস্যু, 'বাস, তৈরি হয়ে গেল আমার গোটা দঙ্গল, থুরি, গোটা দল।

আমি নিজেকে ক্যাপটেন — সর্দার বলে ঘোষণা করছি। হুকুম দেব আমি। কারো আপত্তি আছে?'

বুঝতেই পারছ, কে আর আপত্তি করবে।

'তোফা!' বললে জলদস্যু, 'তোফা! যা আমি আগেই ভেবেছিলাম। এবার যাওয়া যাক কোথাও ডাকাতি করি। বড়ো একঘেয়ে লাগছে।'

'ডাকাতি করে কী লাভ?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে গুপ্তচর সিংধেল।

'মাথায় তোর গোবর! ডাকাত ডাকাতি করছে না এ তুই কোথায় দেখেছিস? এ্যাঁ? বইয়ে সেসব ঘটে না।'

'আর যদি আমরা মারা পড়ি?'

'আমার ভয়-ডর নেই। আমি হলাম নির্ভীক। চলে আয় দোস্ত পেছু-পেছু। কদম ফ্যাল — এক-দুই, এক-দুই!'

ডাকাতিতে বেরুল দস্যুরা।

অধ্যায় বিশ

গরম দুধের খোঁজে সর্বকর্মা

চুল্লির মধ্যে যতটা পারা যায় শুকনো পাতা গুঁজে চুপি চুপি রুগীর কাছে এল সর্বকর্মা।

ঘুমের মধ্যে ছটফট করছিল পেন্সিল।

লোহার মানুষটি ভাবলে, 'ওর গরম দুধ খাওয়া দরকার, তাহলে সেরে যাবে। দুধ আঁকতে আমি পারি না। তাহলেও কিছু একটা উপায় করতে হয়।'

লেপটা ঠিক করে দিয়ে সে বাইরে বেরুল খুবই দুঃখী-দুঃখী মুখে।

সকাল হয়ে আসছিল। রাত্রে গাছগুলোকে মনে হয় কালো, এখন তাদের দেখাচ্ছে কেমন ছেয়ে-ছেয়ে, নীলচে। প্রতি মুহূর্তেই তা সবুজ হয়ে উঠছে। ঘরবাড়ির শার্সিগুলো হয়ে উঠছে ফিকে, ঝিকিমিকি।

শহরের চকে গিয়ে দাঁড়াল সর্বকর্মা, জানে না কোন দিকে যাবে। এখনো কোনো উপায় ঠাওরাতে পারে নি সে।

চকে আর আশেপাশের রাস্তাগুলোয় টাটকা-সেঁকা পাঁউরুটির গন্ধ উঠছে সকালের ঠাণ্ডা বাতাসে। আর তপ্ত রুটির সুবাস যে কী অপরূপ, তা কে না জানে!

চকের দূর কোণটায় দেখা গেল দুই নিশাচর দস্যুকে। সর্বকর্মা অবিশ্যি তাদের দেখতে পায় নি, তারাও দেখে নি তাকে।

নিশ্চল হয়ে থেমে গেল ডাকাতেরা। জলদস্যু বাতাস গিললে নাক ভরে। গুপ্তচর বাতাস শুঁকলে।

'উহ, কী ক্ষিদে পেয়েছে,' ককিয়ে উঠল সে।

'ক্ষিদে-চনমনে গন্ধ ছাড়ছে,' বিড়বিড় করলে জলদস্যু আর পেট তার চিড়বিড় করে উঠল ক্ষিদেয়, 'মনে হচ্ছে হাড়-কাঁটা সমেত ভাজা একটা হাঙর গোটা চিবিয়ে খাই। পেটে আগুন জ্বলছে!'

'ঢঙ-ঢঙ-ঢঙ-ঢঙ!' বেজে উঠল শহরের মিনার ঘড়ি। গাছগুলো হয়ে উঠল পুরো সবুজ। চালের ওপরে, নিচে, ঝুলবারান্দায় জেগে উঠল পায়রারা, ঝটপট করলে ডানা। ময়ূর-রঙা মেঘের মতো তারা নেমে এল চকে, ফলে চকটাও হয়ে উঠল ফিরোজা।

চকে এল মালগাড়ির মতো লম্বা একটা মোটর ভ্যান। এসে থেমে গেল। সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করলে না পায়রাগুলো। সারা জায়গাটা জুড়ে রইল তারা, উড়ে যাবার লক্ষণও দেখালে না।

ভ্যানটা রেগে ফোঁসফোঁস করলে, গর্জন তুললে ইঞ্জিনে। পায়রারা কিন্তু গরবীর মতো রাস্তা জুড়ে পায়চারি করতে লাগল চাকার সামনেই, কোথাও যাবার চাড় নেই তাদের। তখন বিরক্ত হয়ে কেবিন থেকে লাফিয়ে নামল শাদা স্মক পরা একটি লোক, হাত নেড়ে তাড়া দিতে লাগল:

'হুস! হুস!'

অনিচ্ছায় উড়ে যেতে লাগল পায়রাগুলো। হাত নেড়ে তাড়া দিতে দিতে লোকটা চলল আগে। তার পেছু পেছু ধীরে ধীরে গোটা চকটা পাড়ি দিতে হল ভ্যানকে।

ভ্যান থামল মস্তো এক কনফেকশানারির সামনে। দিনে রাতে দরজা তার বন্ধ হয় না। রাতে দোকান ভরে ওঠে কেক, পিঠে, বিস্কুট, লজেন্স, চকোলেটে, আর দিনের বেলা সকাল থেকে সন্ধের মধ্যে কেক, বিস্কুট, লজেন্স, চকোলেট উজাড় করে দিতে থাকে হাসিখুশি খদ্দেররা।

মনমরা লোক, গোমড়া-মুখো খদ্দের কেন জানি এ দোকানে কখনো ঢোকে না।

ভ্যানটা থেকে ভ্যানিলার পিঠে-পিঠে গন্ধ ছাড়ছিল। দোকানের লোকেরা বেরিয়ে এসে ভ্যানের দরজা খুলে নানা রকম বাক্স বয়ে নিয়ে যেতে লাগল ভেতরে।

দস্যু দুজন সন্তর্পণে গুঁড়ি মেরে আসতে লাগল মজুরদের দিকে। একজন আগে আগে, আরেকজন পেছিয়ে, যেন গুঁড়ি মেরে আসাটা তার পক্ষে কঠিন হচ্ছে। সঙ্গে বেড়াল-গমনে কেলে-ছোপ।

'তুই ওকে বল: "হ্যান্ডস্ আপ"!' ফিসফিস করে বললে প্রথম দস্যু, 'আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকব। যেই ওরা তোকে দেখে ভয়ে থ' মেরে যাবে, অমনি আমি লাফিয়ে এসে লুটপাট শুরু করব। নে, এগো।'

'আমি প্-পারব না। আমি যে রোগা-পটকা,' মিনতি করলে দ্বিতীয় দস্যু, 'আমার হুমকিতে কানই দেবে না। তুই বরং গিয়ে বল: "হ্যান্ডস্ আপ"! আমি থাকব এখানে।'

'আগে তুই!' হিসিয়ে উঠল প্রথম জন।

'আমি প্-পরে!' কাঁদো কাঁদো গলায় বললে দ্বিতীয়।

'কাজে ব্যাঘাত করো না ছেলেরা,' দস্যুদের দেখে বললে মজুর। দস্যুদের নিশ্চয় চিনতে পারে নি সে, 'ব্যাঘাত করো না। এ সময় তোমাদের ঘুমানোর কথা। যাও তো, চটপট বাড়ি!'

'হ্যান্ডস্ আপ!' মজুরের দিকে লাফিয়ে এসে ঘোর গলায় গর্জন করে উঠল প্রথম দস্যু।

'তোমায় যে হাত তুলতে বলা হচ্ছে, কানে যাচ্ছে না!' পাশের বাড়ির কোণের আড়াল থেকে চিঁচিঁ করে উঠল দ্বিতীয় ডাকু।

'তোমাদের সঙ্গে খেলবার সময় নেই গো ছেলেরা,' হেসে উঠল মজুর, ওদের দিকে তাকালেও না।

ভ্যান থেকে সে বার করলে সুগন্ধি লজেন্সের বাক্স।

'হ্যান্ডস্ আপ!!' গর্জে উঠল প্রথম দস্যু।

'গর্-র-র-র!' খেঁকিয়ে উঠল কেলে-ছোপ।

মজুর যেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে গেল, অমনি তার বাক্সের সঙ্গে আচমকা ধাক্কা লেগে গেল দস্যুর।

ছিটকে সে পড়ল গিয়ে এক্কেবারে দূরে, ঝাঁটার মতো দাড়ি তার ঝাঁট দিয়ে গেল রাস্তা।

অবাক হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে মজুর, কেউ কোথাও নেই।

বেচারা ডাকাত কাছের বাড়িটাও পেরিয়ে গিয়ে বসেছিল রাস্তার ওপর। দ্বিতীয় ডাকু আর ঝাঁকড়া কুকুরটা কেমন করে যেন গিয়ে সেঁধিয়েছিল ডাস্টবিনে, দাঁত কেলিয়ে ঠকঠকিয়ে কেঁপে উঁকি দিচ্ছিল তার ভেতর থেকে।

মজুর বাক্সটা দোকানে জমা দিয়ে পরের বাক্স নেবার জন্যে ফিরে আসতেই গাড়ির সামনে দেখতে পেলে সর্বকর্মাকে।

'তুই চিৎকার করছিলি বুঝি?' জিজ্ঞেস করলে মজুর।

'না, আমি তো চ্যাঁচাই নি। দিন, আপনার বাক্স বইতে সাহায্য করি,' একেবারে সাবালকদের মতোই বললে সর্বকর্মা।

হাসল মজুর:

'ধন্যবাদ রে খোকা। এই নে তার জন্যে একটা পুরস্কার — লজেন্স। তোকে ছাড়াই আমি পারব। এ বাক্স তোর পক্ষে ভারিই হবে।'

অধ্যায় একুশ

ট্র্যাফিক-আইন না মানা পায়রা

অত ভোরে কেন ছোট্ট মনমরা সর্বকর্মা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটা মজুর জানত না। জানত না যে অসুস্থ পেনসিলের জন্যে একটা লজেন্সে চলবে না। দরকার গরম দুধ আর টাটকা রুটি। মজুরকে সে কথা বলতে চেয়েছিল সে, কিন্তু সেই সময়েই চকে নানা দিক থেকে এসে পেঁছিল মালগাড়ির মতো দেখতে নানা রঙের যত ভ্যান। কেবিন থেকে স্মক পরা লোকেরা বিরক্ত হয়ে নেমে হাত নেড়ে পায়রা তাড়াতে লাগল।

'হুস-হুস-হুস!' তাড়া দিতে লাগল তারা।

পায়রার ঝাঁকটা উড়ছিল চকের ওপর, ফিরে আসছিল, কেউ হাত নাড়া থামালেই এসে নামছিল রাস্তার ওপর, বন্ধ করে দিচ্ছিল পথ।

'আমি রুটিওয়ালা,' বললে একজন লোক, 'রুটি পেঁছে দিই দোকানে-দোকানে। শীগগিরই দোকান খুলবে। লোকে আসবে রুটি কিনতে, অথচ টাটকা রুটি তখনো গিয়ে পেঁছবে না।'

'আমি দুধ বয়ে দিই,' বললে আরেকজন, 'শীগগিরই খোকা-খুকিরা জেগে উঠবে, কিন্তু দুধ পাবে না, মিষ্টি পরিজ রেঁধে দিতে পারবে না মায়েরা। দোকানে-দোকানে দুধ যে আমি পেঁাছে দিতে পারব না সময়মতো।'

'আমার কাজ মাছ পেঁাছনো,' নালিশ করলে আরেকজন, 'পায়রা তাড়াবার জন্যে রাস্তায় আমার রোজ বিস্তর সময় যায়। সেইজন্যেই দোকানে সব সময় জ্যান্ত রুই-কাতলা মেলে না।'

'আমি সসেজওয়ালা, সসেজ পেঁাছই,' ফ্যাসফেসে ভাঙা গলায় বললে চার নম্বর, 'অনবরত "হুস-হুস" করে চ্যাঁচানোর ফলে আমার গলা ব্যথা করছে। হাত নেড়ে পায়রা তাড়াতে তাড়াতে হয়রান হয়ে পড়েছি। কোনো ভয়-ডর নেই পায়রাগুলোর, কারো কথা শোনে না। এমন কি ট্র্যাফিক-পুলিসকেও পরোয়া করে না। কেয়ার করে না ট্র্যাফিক-সিগন্যাল।'

'এভাবে আর কাজ করা যায় না,' কলরব করে উঠল বাকি সবাই, 'কিছু একটা উপায় করতে হয়। এ নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে কাগজে! মাথা ঘামাচ্ছে বিজ্ঞানীরা, কিন্তু কোনো হিল্লে হচ্ছে না। কী হবে তাহলে?'

'বাজে কথা!' বলে উঠল সর্বকর্মা, 'আমি উপায় ঠাওরেছি!'

'কে লোকটা? কে হে?' সঙ্গে সঙ্গেই কলরব করে উঠল সবাই।

'বোধ হয় কোনো উদ্ভাবক বৈজ্ঞানিক,' বললে রুটিওয়ালা, 'অনেক আগেই আমার চোখে পড়েছিল। ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবলি কী যেন ভাবছে।'

'উপায় আমি বার করেছি,' বললে সর্বকর্মা, 'তোমাদের "হুস-হুস" করে চেঁচাতেও হবে না, হাতও নাড়তে হবে না। আমায় কেবল দাও তার, কাঠের ডাণ্ডা, করাত, হাতুড়ি, স্ক্রু-ড্রাইভার, ইস্ক্রুপ, সাঁড়াশি আর যত ন্যাতাকানি। কী করতে হবে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি।'

'কাঠ-কুট আমি দিচ্ছি,' বললে ছুতোর, 'নাও-না কত চাই। নিজেই আমি তোমায় সাহায্য করব।'

'যন্ত্রপাতি আমি দিচ্ছি,' বললে তালা-মিস্ত্রি, 'আমাকেও তোমার যোগাড়ে করে নাও।'

'আমি দিচ্ছি তার-টার যা লাগবে,' বললে ফিটার।

'ন্যাতাকানি নাও আমার কাছ থেকে,' বললে তাঁতী।

'আমরাও কাঁধ লাগাব,' বাকি সবাইরা বললে স্মক খুলে।

পরের দিন খবরের কাগজে বেরিয়েছিল:

অসাধারণ উদ্ভাবন!

বহুদিন ধরে ড্রাইভার আর ট্র্যাফিক-পুলিসেরা যার প্রতীক্ষায় ছিল, অজানা এক প্রতিভাবান ডিজাইনার সেটি কাল বানিয়ে দিয়েছেন। পায়রা চাপা দেবার আশঙ্কা ছাড়াই এখন যে কোনো লোক শহরে গাড়ি চালাতে পারবেন। সমস্ত গাড়িতেই লাগানো হবে তাড়না-পাখসাট, এটা হল উদ্ভাবনটার নাম, সারা শহরে যাতে সাড়া পড়ে গেছে। জিনিসটা আর কিছুই নয়, গাড়ির সমুখে লাগানো একটা লাঠি। তার ডগায় ন্যাতাকানি বাঁধা। গাড়ির সামনেকার স্ক্রীনে জল মোছার জন্যে যে দুটো ব্রাশ কাজ করে, তাদের সঙ্গে লাঠিটা তার দিয়ে সংযুক্ত। ইঞ্জিন চালালে তারে টান পড়বে কখনো বাঁয়ে কখনো ডাইনে, ফলে ন্যাতাকানিগুলোও এদিক ওদিক লটপট করে পায়রা তাড়িয়ে দেবে। উদ্ভাবনটা আশ্চর্য রকমের সহজ!..

দুঃখের বিষয় হৈচৈর মধ্যে উদ্ভাবকের নামটা কেউ জেনে রাখে নি। এ ভ্রান্তি অমার্জনীয়!

কিন্তু এ হল পরের দিন যা লেখা হয়েছিল খবরের কাগজে। আর এদিন কিন্তু এ গাড়ি থেকে ও গাড়িতে ছুটছিল সর্বকর্মা, এটা দেখিয়ে দিচ্ছিল, ওটায় প্যাঁচ কষছিল, বেঁধে দিচ্ছিল কিছু, পরামর্শ দিচ্ছিল নানা রকমের। ঠিক আধ-ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে গেল কাজ। সবাই ধন্যবাদ দিলে তাকে, করমর্দন করলে, নিমন্ত্রণে ডাকলে বাসায়।

গরম রুটি এনে দিলে রুটিওয়ালা।

'এটা আপনার জন্যে,' হাসিমুখে বললে সে।

দুধওয়ালা দিলে বড়ো দুই ক্যানেস্ত্রা দুধ, হলদে রঙের মাখন, এক বয়াম টক ক্রীম। মাছওয়ালা দিলে মাছ, সসেজওয়ালা সসেজ।

'এটা আমার উপহার,' ভাঙা গলায় বললে সে, 'অসাধারণ এক ওস্তাদ আপনি।'

ফলওয়ালা ফল দিলে। কনফেকশানার দিলে লজেন্স কেক। মিস্ত্রি দিলে সব মাল বইবার ঠেলাগাড়ি। প্রত্যেককেই ধন্যবাদ দিলে সর্বকর্মা। শুধু আইসক্রীম সে কিছুতেই নিতে চাইলে না। একটু আহতই হয়েছিল আইসক্রীমওয়ালা।

'দেখলি তো,' বললে জলদস্যু, জিভে জল এসে গিয়েছিল তার, 'অমন একটা মরকুটের জন্যে কী খানা-দানা। ভাগ্য বটে! আর আমাদের কপালে লবডঙ্কা!'

'রুটির একটু চটাও যদি দিত!' করুণ কাঁদুনি গাইলে সিঁধেল।

সবার অলক্ষ্যে এমন কি জলদস্যুরও অগোচরে কয়েকটা বনরুটি সে আগেই মেরে দিয়ে লুকিয়ে ফেলেছিল রেন-কোটের নিচে। এখন কাঁদুনি গাইলে শুধু এমনি, লোক দেখানোর জন্যে, কাউকে যাতে রুটির ভাগ দিতে না হয়। গরম-গরম রুটি, গায়ে ছ্যাঁকা লাগছিল, তাহলেও গুপ্তচর সিঁধেল সহ্য করে গেল।

তাড়না-পাখসাট বসিয়ে গাড়িগুলো অবাধে চলে গেল দিগ্বিদিকে। সবচেয়ে শেষে গেল রুটিওয়ালা। অনেকক্ষণ ধরে সে তার শাদা স্মকটা খোঁজাখুঁজি করলে, পেলে না। সেটাও মেরে দিয়েছিল সিঁধেল। তালা-মিস্ত্রির স্ক্রু-ড্রাইভারটাও হাতালে সে। বলা যায় না দরকারে লেগে যেতে পারে।

হয়তো ওই ওর স্বভাব। ঢিল, পুরনো পেরেক, ইস্ক্রুপ, কড়ি, বোতাম, তার, পেতলের টুকরো — অনেক ছেলেই তো এই ধরনের যতরাজ্যের আজেবাজে জিনিসে পকেট বোঝাই করে।

অধ্যায় বাইশ

ভয়াবহ ঘটনার শুরু

ঠেলাগাড়িতে সমস্ত উপহার চাপিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরছিল সর্বকর্মা।

গাড়িটা ভারি কম ছিল না। ঠেলছিল সে, টানছিল, পায়ে ভর দিয়ে চাপ দিচ্ছিল, ফোঁসফোঁস করছিল, পোঁটা ঝরাচ্ছিল, তবেই খানিকটা করে এগুচ্ছিল গাড়িটা।

'হতচ্ছাড়া!' গর্জন করলে ক্যাপটেন টগবগ, 'চলে যাচ্ছে ও, অথচ লুট করা যাচ্ছে না। ইমানদার নিভীক দস্যুরা দিনের বেলায় লুটপাট করে না কখনো। কেতাবে তেমন দেখা যায় নি।'

সর্বকর্মার দিকে তাকিয়ে ছিল সিঁধেল, অবিশ্বাস্য এক মতলব কিলবিল করে উঠল তার ছোট্ট মাথায়। ফ্যাকাসে হয়ে উঠল সে।

'মাথায় আমার একটা মতলব খেলেছে। একটা মতলব!..' ফিসফিসিয়ে কথাটা বলে সে তাকাতে লাগল চারিদিকে।

'কী সেটা?' জলদস্যুও জিজ্ঞেস করলে ফিসফিসিয়ে, 'জলদি বলে ফ্যাল।'

'পেনসিলকে আমাদের পাকড়াও করা দরকার, তারপর...' আশেপাশে চাইলে গুপ্তচর, 'তারপর জোর করে ওকে দিয়ে আমাদের যা ইচ্ছে আঁকিয়ে নিতে হবে।

তাড়না-পাখসাট আবিষ্কার করারও দরকার হবে না, গাড়িও ঠেলতে হবে না। কিছুই করব না আমরা। অথচ সব আমাদের থাকবে। সবই এঁকে দেবে পেনসিল। সবকিছু।'

'হুররে!' চেঁচিয়ে উঠেই ক্যাপটেন টগবগ সঙ্গে সঙ্গেই দুহাতে মুখ চাপা দিলে নিজের।

'হুররে!' এবার ফিসফিসেয়ে বললে জলদস্যু, 'ওকে দিয়ে আমি জাহাজ আঁকিয়ে নেব। জাহাজ নইলে আবার জলদস্যু কী! আমার জাহাজে থাকবে বাঘা বাঘা কামান। মহাসাগরে পাড়ি জমাব। জাহাজের খোলে থাকবে নোনা মাংস, মানে, নামটা তার এখন স্মোকড-সসেজ, আর থাকবে দুধের পিপে, থুরি — মদের পিপে। তারপর! তারপর!..' উল্লাসে ক্যাপটেনের দম আটকে এল, 'তারপর সে আঁকবে অন্যসব জাহাজ, আমি সেগুলো লুট করব। চমৎকার! লাগাও আগুন! ডুবিয়ে দাও! ও আঁকবে একের পর এক জাহাজ। একের পর এক লুট করে যাব আমি!'

'গর্-র-র-র!' খেঁকিয়ে উঠল খেঁকুরে কুকুর। ও বলতে চেয়েছিল: 'আর আমি ওকে দিয়ে মাংসের টুকরো আঁকিয়ে নেব। একের পর এক, একের পর এক।'

'আমার পরে তুই-ই সবচেয়ে ডাকসাইটে ডাকাত!' বলে গুপ্তচরকে দোস্তির কোলাকুলিতে ঠেসে ধরল ক্যাপটেন টগবগ।

গরম পাঁউরুটি লেপটে গেল সিঁধেলের গায়ের সঙ্গে।

'উহ্!' ককিয়ে উঠল সে।

পাঁউরুটি খসে পড়ল রাস্তায়। সঙ্গে সঙ্গেই তার একটাকে গিলে ফেললে কেলে-ছোপ।

'বটে!' দোস্তের সকরুণ মুখের দিকে চেয়ে তর্জন করলে জলদস্যু, 'লুকিয়ে রাখা হয়েছে! আমার কাছ থেকে!' পিস্তল বার করে সে দোস্তের লম্বা নাকের ওপর ধরল, 'ফের যদি তুই কখনো আমার সঙ্গে চালাকি মারিস, খুন করব। এবার মাপ করে দিচ্ছি। কিন্তু তোকে যেতে হবে ওই ক্ষুদে নিষ্কর্মাগুলোর বাড়িতে, কী করে পেনসিলকে লোপাট করা যায় তার সুলুক-সন্ধান জেনে আসবি।'

'ভয় লাগছে। আমি যে রোগা-পটকা!' ঘ্যানঘ্যান করলে গুপ্তচর।

'কোনো ওজর চলবে না।' হুঙ্কার দিলে সর্দার, 'লোহার ওই সঙ সর্বকর্মাটা তার গাড়ি ঠেলে ঘরে পেঁছবার আগেই ছুটে যা!'

অধ্যায় তেইশ

শিক্ষিত ডাক্তার

ডাক্তার যাচ্ছিল নীল ঠাণ্ডা বুলভারের ঝোপের আড়ালে ঢাকা ছোট্ট বাড়িটার দিকে। কে তাকে ডেকেছে, পেনসিলের রোগের কথা কে তাকে বলেছে, সেটা আমরা জানি না।

ডাক্তারের গায়ে শাদা স্মক। সে স্মক থেকে ওষুধের নয়, কেন জানি রুটির গন্ধ বেরুচ্ছে। রুটি দিয়েই সে রোগীর চিকিৎসা করে হয়তো?

ডাক্তারের নাকটা খুবই লম্বা আর ফ্যাকাসে, মুখখানা মনমরা। কেবলি চারিপাশে তাকাচ্ছিল সে, কান পেতে শুনছিল। ঝোপের মধ্যে সেঁধিয়ে সে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে। পা টিপে টিপে দরজার কাছে এসে আবার চেয়ে দেখলে আশেপাশে। চক্কর দিলে বাড়িটা, উঁকি দিলে জানলায়, তারপর ঢুকল ভেতরে।

অঘোরে ঘুমচ্ছিল পেনসিল।

'হি-হি!' আনন্দে হাত ঘসলে ডাক্তার, 'বাছাধন তাহলে এইখানেই। তোর লম্ফবাজটি আসার আগেই — হি-হি, সারিয়ে তুলব তোকে। নিয়ে যাব, হা-হা-হা, খোলা হাওয়ায়, হি-হি, গুম করে দেব...'

ডাক্তারের খুশি আর ধরে না। তুলতুলে তোয়ালেটা দিয়ে সে কষে মুখ বাঁধলে ঘুমন্ত পেনসিলের। তারপর চটপট বাঁধন দিলে হাতে পায়ে।

খাট থেকে ডাক্তার টেনে তুলছিল রোগীকে। কিন্তু এই সময় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সর্বকর্মা। একজন পথচারী তার ঠেলাগাড়িটা পেঁছে দিয়েছিল বুলভার পর্যন্ত। তাই এত তাড়াতাড়ি আসতে পেরেছে সে।

আচমকা তাকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেল ডাক্তার।

'কে আপনি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে সর্বকর্মা।

'আমি সিং-সিং-সিং শ্রী ডাক্তার,' তোতলাতে লাগল ডাক্তার, চেয়ে দেখতে লাগল কেমন করে সরে পড়া যায়, 'আমি সত্যিকারের শিক্ষিত ডাক্তার।'

'কিন্তু পেনসিলের খবর আপনি পেলেন কী করে?'

'আ-আ-আ-মরা সব খবর পাই।'

'কিন্তু কী করছেন ওকে নিয়ে?'

'বোকা ছেলে!' সাহস হল ডাক্তারের, 'আমি ওর চিকিৎসা করছি।'

'আমি তা একটু দেখতে পারি?'

‘কোনো ক্রমেই নয়!’ একেবারেই ভয় কেটে গেছে ডাক্তারের, ‘যা ছেলে, বরং একটু খেল গে বাইরে! আমি তোকে হি-হি-হি... পরে ডাকব...’

‘আমি কোনো ব্যাঘাত করব না, শুধু চুপটি করে বসে থাকব।’

‘বেআক্কেলে নীরেট লোহার মগজ!’ হিসিয়ে উঠল ডাক্তার।

‘কিন্তু ওকে বেঁধেছেন কেন?’ জিজ্ঞেস করল সর্বকর্মা।

‘একেবারে হাঁদা,’ চটে উঠল ডাক্তার, ‘রোগীর পক্ষে কথা বলা, নড়া-চড়া করা যে বারণ। তা জানিস না? অমন বোকার মতো বকবক করে আমায় বাধা দিবি না বলছি। বরং ছুটে যা ডাক্তারখানায়, ওষুধ নিয়ে আয়। নইলে আমাদের বেচারি, আমাদের আদরের যাদুমণি পেনসিল-ভাইটি মারা যাবে, যে-কেক তুই এনেছিস, তা আর কখনোই ওর মুখে উঠবে না।’

সর্বকর্মার সমস্ত স্প্রীঙগুলো শিউরে উঠলে।

‘কী ওষুধ লাগবে চট করে বলুন, আমি গিয়ে দোকান থেকে নিয়ে আসি।’

‘হুম্...’ বললে ডাক্তার, ‘নিয়ে আসবি... ইয়ে... নিয়ে আসবি “বুরামুরাদুরাপির” ওষুধ। বুঝেছিস!’

সর্বকর্মা ভাবলে, ‘এমন খটমট নাম যখন, তখন নিশ্চয় খুব মোক্ষম ওষুধ। কেবল শিক্ষিত ডাক্তারেই এ সব ওষুধের খবর রাখে।’

‘বুরামুরাদুরাপির,’ রাস্তায় লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে যেতে নামটা আওড়াচ্ছিল সে।

মোড় ঘুরতেই তার ধাক্কা লাগল পাটল-দাড়ি এক অচেনা লোকের সঙ্গে, কুর্তার সবকটা বোতাম তার বন্ধ।

টাটকা রুটি গিলছিল দেড়েল। বললে:

‘হতচ্ছাড়া! কী আস্পর্ধা তোর, হুমড়ি খেয়ে পরিস সাধু সজ্জনের ঘাড়ে?’

‘মাপ করবেন, হঠাৎ হয়ে গেছে...’

সর্বকর্মার মনে হল দেড়েল যেন চোখ মটকালে তার দিকে। ভাবলে, কোথায় যেন ওকে দেখেছি, আর ভাবতে গিয়েই ওষুধের নামটা তার মন থেকে একেবারেই উড়ে গেল।

‘যাঃ,’ বললে সে, ‘মনে পড়ছে না! ওষুধের নামটা ভুলে গেলাম যে!.. কুরা... নুরা...’ মনে করার চেষ্টা করল সর্বকর্মা, ‘আপনি জানেন না ওষুধের নামটা?’ জিজ্ঞেস করলে সে দেড়েলকে।

‘ওষুধ আবার কীসের?’ মুখ টিপে হাসল দেড়েল, ‘বড়ো আমার দায় পড়েছে তোর বেজন্মা ওষুধের নাম জানতে।’

ফিরে বাড়ি মুখো ছুটল সর্বকর্মা। ভাবছ বুঝি ফন্দিটা ও টের পেয়ে গেছে? মোটেই না। ও শুধু ভাবলে গিয়ে ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধের নামটা আবার জেনে নেবে।

'আরে দাঁড়া, দাঁড়া!' সচকিত হয়ে উঠল দেড়েল, 'কিসের ওষুধ বললি?'

সর্বকর্মা কিন্তু ছুটতেই থাকল, ফিরেও চাইলে না।

'বলছি দাঁড়া! বাড়ি যাস নে! দাঁড়া বলছি। আমি তোকে ধাঁধার উত্তর বলে দেব। দাঁড়া! গল্প বলব! গা-ছমছম করা গল্প!..' সর্বকর্মাকে থামাবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করে উঠল দেড়েল।

আচমকা হুইসিল বেজে উঠল জোরে। দেড়েলের পথ আটকে কড়া গলায় ট্র্যাফিক-পুলিস বললে:

'রাস্তা চলার নিয়ম ভাঙছেন মশায়। এখান দিয়ে রাস্তা পার হওয়া বারণ।'

'আমি নতুন লোক!' সর্বকর্মার কানে এল, দেড়েল বলছে, 'আর করব না, মাইরি বলছি, আর এমন হবে না।'

দরজার অলিন্দ পর্যন্ত ছুটে গিয়ে সর্বকর্মা দরজা খুললে প্রায় নিঃশব্দে। কেননা ওষুধের নামটা ভুলে গেছে বলে তার ভারি সঙ্কোচ হচ্ছিল। ইতস্তত করছিল ডাক্তারকে শুধাতে।

ডাক্তার কিন্তু ওকে লক্ষ করে নি। হাত-পা বাঁধা পেনসিলকে ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টায় রেগে ফোঁস ফোঁস করছিল সে।

ব্যাপারটা সবই এবার বুঝলে সর্বকর্মা। প্রচণ্ড চিৎকার করে সে চুল্লির শিকটা নিয়ে বসিয়ে দিলে শিক্ষিত ডাক্তারের মাথায়।

আর্তনাদ করে উঠল ডাক্তার। পেনসিলকে ফেলে রেখে সে কী তার ভোঁ-দৌড়!.. চারটে ট্রলিবাস, দুটো মোটর সাইকেল, ছ'টা সাইকেল, একটা মোটরগাড়ি আর চারটে ট্রাক — সব কটাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল সে।

'দেখালে একখান! দেখালে!' বলাবলি করলে ছেলেপিলেরা, 'ওহ্, দেখিয়ে দিলে!..'

ডাক্তারকে দৌড়তে দেখে দেড়েল লোকটা কেন বললে, 'গেছি এবার!' বোঝা গেল না। এবং সেও দৌড়তে লাগল ডাক্তারের পেছু পেছু। তার পাল্লা সে ধরতে পারল কেবল শহর শেষ হবার পর।

এই সময় সর্বকর্মার মনে পড়ে গেল দেড়েল লোকটা আর ডাক্তারের চেহারাটা সে কোথায় দেখেছিল।

দেখেছিল ভেনিয়া কাশকিনের আঁকা ছবিতে।

অধ্যায় চব্বিশ

প্রতিকের খোঁজে

বন্ধুকে বাঁচানোর পর সর্বকর্মা তার বাঁধন খুলতে যাবে, এমন সময় চোখে পড়ল পেনসিল প্রথমে এক চোখ মেলছে, তারপর দ্বিতীয় চোখ, তারপর চোখ পিট পিট করে যেন বলতে চাইছে: 'আমায় বেঁধে রেখেছিস কেন?'

'চুপ করে থাকবি,' হাত তুলে শাসাল সর্বকর্মা, 'কথা বলা তোর বারণ। যদি কথা দিস যে কথা বলবি না, তাহলে বাঁধন খুলে দেব।'

'ম-ম-ম...' বললে পেনসিল।

মানে বলতে চেয়েছিল: 'কথা দিচ্ছি, কথা বলব না।'

সর্বকর্মা তার বাঁধন খুলে দিলে, চুল্লি ধরিয়ে দুধ ফোটালে কেটলিতে, কাপে তা ঢেলে জোর করে পেনসিলকে খাওয়ালে প্রথমে এক কাপ, তারপর আরেক কাপ — মোট তিন কাপ দুধ!

'নে, এবার বল তো, "আ-া-া"।'

'আ-া-া!'

'বল, "উ-উ-উ"।'

'উ-উ-উ।'

'বল, "ও-ও-ও"।'

'বল, "এ-এ-এ"।'

'এ-এ-এ!' বলে সর্বকর্মাকে জিভ দেখালে পেনসিল, 'অ্যা-অ্যা-অ্যা! ধুত্তোরি ছাই! আমার আর অসুখ-টসুখ নেই। একেবারে সুস্থ। স্বপ্ন পর্যন্ত দেখেছি, যেন তুই আমি এরোপ্লেনে উড়ছি, তারপর ভেঙে চুরমার। ওহ, কী মজা...'

'তোর অসুস্থ লাগছে না আর?'

'একেবারে না!'

বিছানা থেকে বন্ধুকে টেনে নামাল সর্বকর্মা। ঘরের মধ্যে লাফাতে লাগল তারা, নাচ জুড়লে আনন্দে।

বহাল তবিয়তেই থাকি,
ডাক্তারে দরকারটা কী!

তারপর দীয়তাং ভুজ্যতাং ভোজ, টুকরো-টাকরাগুলো ছুড়ে দিলে পাখিদের দিকে।

'খোকন কোথায়?' জিজ্ঞেস করলে পেনসিল, 'তুই বুঝি ওকে ছেলেপিলেদের সঙ্গে খেলতে যেতে দিয়েছিস? ডেকে ওকে খাওয়ানো যাক।'

মন ভার হয়ে গেল সর্বকর্মার। হাসি থেমে গেল। সকরুণে রিন-রিন করে উঠল তার স্প্রীঙ।

ভারি অবাক হয়ে গেল পেনসিল।

'অসুখ করেছে তোর?'

'না, না, শরীর ভালো আছে। শুধু মনটা খারাপ।'

বলে লোহার মানুষটি পেনসিলকে শোনাল সেই দুঃখের কাহিনী: প্রুতিক এখন কিশোর টেকনিশিয়ান।

উঠে দাঁড়াল যাদুকর পটুয়া।

'প্রুতিককে খুঁজে পেতেই হবে। ঠগ হয়ে ওঠা ওর কিছুতেই চলবে না। চল সর্বকর্মা, যাই!'

অধ্যায় পঁচিশ

দস্যুদের অশ্ব লাভ

জলদস্যু ক্যাপটেন টগবগ ডাক্তারের স্মকের খুঁটটা চেপে ধরতে পারল একেবারে শহরের শেষ সীমানায়, আর তখনি কেবল ডাক্তারের উদ্দাম ছুটটা থামল। কপালে ডাক্তারের দিব্যি একখান ফুলো কালসিটে। স্মকটা খুলে সে শিক্ষিত ডাক্তার হওয়া ছাড়লে। ফালি ফালি করে সেটাকে ছিঁড়ে সে মাথায় বাঁধলে ব্যাণ্ডেজের মতো। তাতে অন্তত কপালের ওই লজ্জাকর ফোলাটা কারো চোখে পড়বে না।

'বীরপুরুষ,' টিটকারি দিলে জলদস্যু, 'কোথাকার কোন হরিদাস পাল, তার সঙ্গেও পেরে উঠল না!'

'লোহার ওই সঙটার সঙ্গে লেগে দ্যাখ না। মারতে আসবে।'

'বড়ো বললি! মারপিটে আমিও দড়। দেব এমন এক ঘা চালিয়ে!'

'জানি, জানি কেমন তোর সাহস,' গজ গজ করলে গুপ্তচর।

'কী? কী বললি?' ভুরু কোঁচকালে জলদস্যু।

'বলছি যে আপনার সাহস সবার বাড়া... উহ্, এমন লাগছে! হতচ্ছাড়া লোহার চ্যাঙড়া!' ককিয়ে উঠল গুপ্তচর সিঁধেল।

'নে, মন খারাপ করিস নে,' দোস্তের পিঠ চাপড়ালে জলদস্যু, 'ওদের আমরা ধরবই। পচা হাঙরের দিব্যি! আমাদের হাত ছাড়িয়ে পেনসিল মেনসিলকে পালাতে হচ্ছে না।'

'ছোঁড়াটার ইস্ক্রুপ খুলে নেব আমি! স্প্রীঙ ছিঁড়ে নেব! পা দিয়ে থ্যাঁতলাব! কেটে টুকরো টুকরো করব। আমি! আমি... উহ্, বড্ডো টাটাচ্ছে!'

'এগো!' হুকুম দিলে ক্যাপটেন টগবগ, 'আটকাতে হবে! ধরতে হবে! ইস্ক্রুপ খুলে নিতে হবে! কেলে-ছোপ, কুত্তা-জান, পথ দেখা আমাদের! হাত নিশপিশ করছে — এই গুলোকে...'

কাদের মারবার জন্যে হাত নিশপিশ করছে সেটা আর জলদস্যুর বলা হল না। চোখে পড়ল ছোট্ট একটা পার্কের রেলিঙে বাঁধা ভারি মিষ্টি দুটি ছোটো ছোটো ঘোড়া। নিশ্চিন্তে তাজা সবুজ ঘাস খাচ্ছিল ঘোড়াদুটো। একটার রঙ পাটকিলে, তাতে শাদা শাদা ছোপ, অন্যটা শাদা, তাতে পাটকিলে দাগ।

'ওঠো ঘোড়ায়!' ক্যাপটেন টগবগ হুঙ্কার দিলে ভেনিয়া কাশকিনের গলায়, 'ঘোড়ায়!'

লাফিয়ে ঘোড়ায় চেপে রওনা দিলে দস্যুরা।

অধ্যায় ছাব্বিশ

নিরুপায় পেনসিল আর সর্বকর্মা

যদি তোমরা জানতে চাও চাঁদে যাবার টিকিট বিক্রি হয় কোথায়, ছেলেপিলেদের জন্যে রকেটে জায়গা বুক করা যায় কোন খানে, অথবা যদি জানতে চাও কার জোর বেশি, হাতির না তিমি মাছের? — তাহলে চলে যাও জিজ্ঞাসা-ব্যুরোতে। শহরের প্রতি রাস্তায় একটি করে কাঁচের ঘেরাটোপ বুথ আছে, প্রকাণ্ড লণ্ঠনের মতো তা দেখতে। একেই বলে জিজ্ঞাসা-ব্যুরো।

তকতকে চকের এমনি এক লণ্ঠনে বসে বই পড়ছিল একটি তরুণী। কেন জানি কেউ তাকে আজ জিজ্ঞাসা করে নি কোথায় চাঁদে যাবার টিকিট মিলবে, তাই তরুণীটি অষ্ট-আশি পাতা এর মধ্যেই পড়ে ফেলে পরের পাতাটা ওলটালে। ঠিক উননব্বুই পাতাটির সময়েই লণ্ঠনের জানলায় দেখা গেল পেনসিলের নাক আর সর্বকর্মার চাঁদি।

'আচ্ছা, খোকন প্রুতিয়াকে কোথায় পাওয়া যাবে, বলুন-না। ও হয়েছে কিশোর টেকনিশিয়ান।'

'মুশকিল,' নিশ্বাস ফেললে মেয়েটি, 'আমাদের শহরে কিশোর টেকনিশিয়ান আছে সাত চল্লিশ হাজার দু'শ প'চাত্তর জন। এ ছেলেটির বয়স কত?'

'ওর?... দু'দিন...'

'ঠাট্টা জুড়েছ!' হেসে উঠল মেয়েটি, 'ঠাট্টার জবাব আমি দিই না।'

মেয়েটি ভাবলে: ভারি মজার ছেলে তো! আচ্ছা কে ওরা? মেয়েটির ইচ্ছে হয়েছিল জিজ্ঞেস করে ওরা কে, কিন্তু করলে না।

কেননা চক দিয়ে যাচ্ছিল শাদা-পাটকিলে ঘোড়ায় দুজন অদ্ভুত সওয়ার। একজন বেশ মানানসই দেড়েল জোয়ান, অন্যজন কাঠির মতো টিঙ-টিঙে, লম্বা তার নাক, ঘাড়ে কলার তুলে দেওয়া। ঘোড়ার দিকে চাইলে মেয়েটি। এদের সে দেখেছে কেবল সিনেমায়।

চারিদিক দেখতে দেখতে সওয়াররা গিয়ে পে'ছল চিড়িয়াখানার ফটকের কাছে, ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে তারা ঝাঁকড়া কালো কুকুরের পেছু পেছু ছুটল ফুটপাথ দিয়ে। কুকুর তাদের নিয়ে গেল যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল পেনসিল আর সর্বকর্মা।

কাঠ-বাদাম রাস্তা থেকে চকে ছুটে এল ট্র্যাফিক-পুলিসের ক্রুদ্ধ লাল মোটর সাইকেলটা। ঘোড়াদুটোর কাছে এসে তা থেমে গেল।

'ফের সেই ঘোড়াদুটো!' কড়া গলায় বললে ট্র্যাফিক-পুলিস, 'কোথায় ঘোড়ার মালিক?'

কিন্তু ক্যাপটেন টগবগ আর গুপ্তচর সি'ধেল এ সময়ে লুকিয়ে লুকিয়ে পেনসিল আর সর্বকর্মার পেছু নিয়েছিল। ওরা কিন্তু তাদের অনুসরক বা ঘোড়া বা ট্র্যাফিক-পুলিস কাউকেই লক্ষ করে নি। দাঁড়িয়ে ছিল ওরা খেলনা দোকানের মস্তো এক শো-কেসের সামনে। আর অমন অপরূপ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে অন্য দিকে কোনো মন থাকে কখনো!

অধ্যায় সাতাশ

কাঁচের শো-কেস, মন্ত্র-পড়া লোহা, ছেয়ে নেকড়ে আর লাল হুড

শো-কেসের আয়নার মতো ঝকঝকে প্রকাণ্ড কাঁচটার ওপাশে মুখ হাঁ করে বসেছিল পুতুল ছেয়ে নেকড়ে। কুটিল চোখে সে চেয়েছিল পুতুল লাল হুড খুকিটির দিকে। লাল হুডের এক হাতে ছোট্ট একটি ঝুড়ি, অন্য হাতে ডেইজি ফুলের তোড়া। নেকড়ে আর লাল হুডের গল্পে যা ঘটে, সেভাবে সে নেকড়েকে জিজ্ঞেস করতে চাইছিল: 'কেন রে নেকড়ে তোর অমন বড়ো বড়ো দাঁত?' চাইছিল কিন্তু পারলে না। কেননা ও যে পুতুল লাল হুড!

নেকড়েরও ইচ্ছে ছিল জবাব দেবে: 'দাঁত আমার, লাল হুড, অত বড়ো বড়ো তোকে খাব বলে।' কিন্তু কিছুই বলতে পারল না নেকড়ে। পুতুল তো।

মন-মাতানো বাজনা বাজছিল। খুলে গেল দোকানের দরজা, গোটা চক ফাটিয়ে মাইকে ঘোষণা হল:

—কিশোর টেকনিশিয়ানরা, চলে এসো আমাদের দোকানে। আগে আমরা শুধু খেলনা বেচতাম, এখন এ দোকানে নানা রকম কাজের জিনিসও কেনা যাবে। হাতুড়ি, করাত, পেরেক, ইস্কুপ, চাকা, কাঠ, তক্তা। হাজার খানেক নানা রকমের গাড়ি, কলের জাহাজ, পাল-তোলা নৌকো, এরোপ্লেন, হেলিকপ্টার বানাবার জন্যে দু'হাজার নানা রকমের জিনিসপত্র।

'শুনলি?' বললে সর্বকর্মা, 'কিশোর টেকনিশিয়ানদের ডাকছে। তার মানে আমাদের প্রুতিকও আসবে।'

'ঠিক বলেছিস,' বললে পেনসিল।

ছুটে ঢুকল ওরা দোকানের প্রকাণ্ড দুয়োর দিয়ে, খেয়ালও করলে না যে তাদের পেছু পেছু ছুটে আসছে দুই গোমড়া মুখ হিংস্র ডাকাত।

হাত ধরাধরি করে পেনসিল আর সর্বকর্মা দোকানের নানান তলা ঢুঁড়ে বেড়াল প্রুতিকের খোঁজে।

'কখন যে ও আসবে?' দীর্ঘশ্বাস ফেললে লোহার মানুষটি।

ডাকাতরাও ঢুকে পড়ল খদ্দেরদের মধ্যে, আড়াল নিলে কখনো থামের পেছনে লুকিয়ে, কখনো স্যুটকেস হাতে খুড়োর চওড়া পিঠের আড়ালে, কখনো ব্যাগ হাতে গিন্নির স্কার্টের আবডালে।

'আমাদের হাত ছেড়ে পালাতে হচ্ছে না,' সাপের মতো হিসিয়ে বললে সিঁধেল।

'ফাঁদে পড়েছে বাছাধন!' জলদস্যুর খুশি আর ধরে না।

সর্বকর্মা আর পেনসিলের ওপর ভালো করে নজর রাখার জন্যে জলদস্যু ঢুকতে গেল সেই বড়ো টেবিলটার তলে, যেখানে কিশোর টেকনিশিয়ানদের হরেক রকম জিনিস ছিল। তার মধ্যে ঘোড়ার নালের মতো দেখতে কী একটা লোহা হঠাৎ টেবিল থেকে লাফিয়ে উঠে প্রচণ্ড ঘা মেরে সেঁটে গেল জলদস্যুর গায়ে।

'মারছে রে!'

'কে মারছে?' জিজ্ঞেস করলে সিঁধেল।

'এই হতভাগা লোহাটা!' ক্ষেপে উঠে জলদস্যু গা থেকে লোহাটা খসিয়ে ছুড়ে ফেললে মেঝেয়।

লোহা কিন্তু পড়ে রইল না। ফের লাফিয়ে উঠে ঘা মারলে জলদস্যুর পেটে।

'লক্ষ্মীছাড়া!' খেঁকিয়ে উঠল জলদস্যু, 'মন্ত্র-পড়া লোহা!'

'ইস্, কী ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন,' বললে সিঁধেল, 'ভাবনা নেই, ওটা সাধারণ লোহা নয় — চুম্বক। আপনার ভোজালিতে গিয়ে আটকে যাচ্ছে।'

চুম্বকটা নিয়ে গুপ্তচর অলক্ষ্যে পকেটে পুরলে।

'কাজে লেগে যেতে পারে!..'

দস্যুরা যখন চুম্বকের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল, সর্বকর্মা আর পেনসিল তখন দোকানী মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলে:

'মাপ করবেন, আমরা প্রুতিককে খুঁজছি। দেখেন নি ওকে? ও হল কিশোর টেকনিশিয়ান।'

'কী বানায় সে?'

'ও জাহাজ ভালোবাসে।'

'জাহাজ? তাহলে প্রশান্ত উপকূলে চলে যান। ছেলেরা সেখানে খেলনা জাহাজ চালিয়ে দেখে। আমার মনে হচ্ছে আপনার প্রুতিক নিশ্চয় সেইখানে। প্রথমে বাঁয়ে ঘুরবেন, তারপর ডাইনে...'

পেনসিল আর সর্বকর্মা দরজা দিয়ে বেরুতে যাবে, এমন সময় ফের চোখে পড়ে গেল দস্যুদের।

'আরে, ওই যে ওরা! ছোট!' হাঁক দিলে জলদস্যু।

অবিশ্যি সে হাঁক কারো কানে গেল না, দোকানটায় এমনিতেই যে খুব গোলমাল।

অধ্যায় আটাশ

হুন্দ মজা

খন্দেরদের ধাক্কাধাক্কি করে ডাকুরা পেনসিল আর সর্বকর্মার পাল্লা ধরবার জন্যে ছুটল। কিন্তু দোকানের ভেতর কারো পাল্লা ধরার চেষ্টা করে দ্যাখো না। চতুর্দিকে ভিড়। সবারই তাড়া, সবাই যাচ্ছে এদিক ওদিক।

কোন একটা দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল ডাকুরা। কিন্তু দেখা গেল জায়গাটা মোটেই রাস্তা নয়। সামনে তাদের লাল হুড পুতুল। ছেয়ে নেকড়ে কুটিল চোখে তাদের দিকে চেয়ে দাঁত বার করলে।

'আরে এটা শো-কেস। শো-কেসে ঢুকে পড়েছি। শীগগির বেরোও!'

কিন্তু ওরা ভেতরে ঢোকামাত্রই জলদস্যুর কাঁধে লেগে ছোট্ট দরজাটা ঝপাং করে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

'আমরা বন্দী হয়ে পড়েছি,' চেঁচিয়ে উঠল জলদস্যু, 'হতচ্ছাড়া এ কাঁচ আমি গুঁড়িয়ে দেব।'

'দাঁড়ান ক্যাপটেন,' রাস্তার দিকে দেখিয়ে ফিসফিসিয়ে বললে সিংধেল, 'ওরা আসছে। আমাদের দেখে ফেলতে পারে! আস্তে! গোলমাল করবেন না!'

পেনসিল আর সর্বকর্মা এগিয়ে আসছিল শো-উইনডোর দিকেই। প্রশান্ত উপকূলে যাবার পথটা ঠিক এর সামনে দিয়েই।

আতঙ্কে ডাকাতেরা ছোটাছুটি লাগালে ভেতরে, খোঁজাখুঁজি করলে কোথায় লুকোয়। কিন্তু লুকোবার জায়গা নেই। কাঁচের ভেতর দিয়ে সবই দেখা যায়।

'হাজতে যাবার সাধ নেই আমার! যাব না হাজতে!' চ্যাঁচালে জলদস্যু, 'আর কখনো করব না!'

জানলার ভেতরে ছোটাছুটি করার সময় গুপ্তচর হঠাৎ ধাক্কা খেল লাল হুডের সঙ্গে, টাল সামলাতে না পেরে লাথি মেরে বসল তাকে। বেচারি লাল হুড পড়ে গেল মেঝেয়, ছিটিয়ে পড়ল তার ডেইজি ফুলগুলো।

'পোড়ারমুখী, কোথাকার!' চটে উঠল সিংধেল, তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠল আনন্দে, 'মনে হচ্ছে একটা উপায় পেয়ে গেছি!'

পুতুলটার বিশ্ববিখ্যাত সেই লাল হুড, অ্যাপ্রন, ফ্রক, ঝুড়ি, মাফলার সব খুলে নিয়ে সে মুহূর্তের মধ্যে পরে নিলে নিজে। শুধু ঝলমলে মেয়েলী মাফলারটা ছুড়ে দিলে জলদস্যুর দিকে।

'এই দিয়ে আপনার দাড়িটা ঢেকে ফেলুন ক্যাপটেন। আপনি হবেন গপ্পটার সেই শিকারী। আর আমি, হি-হি, আমি হব লাল হুড...'

ক্যাপটেন টগবগ তার পার্টাকলে দাড়ি ঢেকে ফেললে মাফলার দিয়ে, কেউ তাকে এখন সনাক্ত করতে পারবে না। তারপর তার প্রকাণ্ড পিস্তলটা তুলে নেকড়ের দিকে তাক করে নিশ্চল হয়ে রইল, যেন সে একটা পুতুল।

'আরে দেখুন, দেখুন,' শো-উইনডোর সামনে থেমে গিয়ে বলাবলি করলে পথচারীরা, 'শিকারী পুতুল। আগে ওটা ছিল না। নতুন এনেছে। আচ্ছা, কত দাম হবে ওটার? কী তেজী শিকারী! একেবারে সত্যিকারের মতো। ছেয়ে নেকড়ে, সাবধান।'

পেনসিল আর সর্বকর্মাও জানলার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে না পড়ে পারল না।

'কী বিকট চেহারার লাল হুড!' অবাক হল পেনসিল, 'ছোট্ট খুকি লাল হুডের নাক অমন লম্বা কেন?'

'খুকি মাত্রেই ভারি কৌতূহলী হয় তো,' বললে সর্বকর্মা, 'তাই নাক ওর লম্বা হয়ে উঠেছে।'

'আরে দ্যাখ, দ্যাখ! লাল হুডের মাথায় দেখছি একটা ব্যান্ডেজ।'

'ছেয়ে নেকড়ে বোধ হয় কামড়ে দিয়েছিল।'

'দেখেছিস, শিকারীর কেমন রাগী-রাগী চেহারা, পিস্তলটাও কী প্রকাণ্ড।'

'নেকড়ে শিকারের জন্যে যে দরকার মস্তো বড়ো পিস্তল।'

এই সব কথা বলাবলি করলে পেনসিল আর সর্বকর্মা। লাল হুড ওদিকে চোখের পলকও না ফেলে চেয়ে রইল কৌতূহলী বন্ধুদুটির দিকে, লাল হয়ে উঠেছিল সে মনের আক্রোশে।

'বিদেয় হও তো ব্যাটারা!' মনে মনে ভাবছিল লাল হুড, 'ক্ষুদে বিচ্ছু সব, সরে পড়ো না চটপট! হাত আমার অবশ হয়ে এসেছে, খিল ধরেছে পায়ে।'

এই সময় একটা মাছি, সাধারণ একটা মাছি উড়ছিল লাল হুডের নাকের কাছে।

'ভন-ভন-ভন-ভন...' গান ধরেছিল মাছিটা।

রাগের জ্বালায় প্রায় কান্না এসে গেল লাল হুডের।

'ভন্-ন্-ন্-ন্-প্' গান গেয়ে মাছিটি বসলে লাল হুডের লম্বা ঘর্মাক্ত নাকে।

লাল হুড এবার আর পারলে না, নাক কুঁচকে এমন এক হাঁচি হাঁচলে যে মাছিটা বো করে ছিটকে গিয়ে পড়ল একেবারে শিকারীর চোখে। বেচারি শিকারী পা দাপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল গাঁক গাঁক করে।

'এ কী কাণ্ড!' অবাক হয়ে বললে পেনসিল।

'বটে!' বলে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল সর্বকর্মা।

'নমস্কার, ডাক্তার মহাশয়। আপনার মহাশয় ফোলাটি কেমন আছে?'

লাল হুড এবার দাঁত কড়মড় করলে সত্যিকারের ছেয়ে নেকড়ের মতো, হুমকি দিলে ঘুসি তুলে, লাফালাফি করতে লাগল ভেতরে। ভারি হাসির ব্যাপার!

'হা-হা-হা!' হেসে উঠল পেনসিল আর সর্বকর্মা।

'হতচ্ছাড়া সব!' খেঁকিয়ে উঠল শিকারী।

'হো-হো-হো!' হাসতে লাগল সর্বকর্মা। ভেঙচি কেটে কাঁচকলা দেখিয়ে সে আরো ক্ষ্যাপাতে লাগল তাকে।

ডাকাতরা তখন রাগে অন্ধ হয়ে কাঁচের কথা ভুলে গিয়েই তেড়ে গেল তার দিকে।

'দম!'

অ-শক্ত কপালে শক্ত কাঁচের ধাক্কা খেয়ে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল ডাকাতদুটো।

'ওহ্, হো-হো-হো! হা-হা-হা!' পথচারীদের হাসি আর ধরে না।

'চললাম! সুখে থাকো এখানে!' বললে পেনসিল।

'আসি তাহলে!..' ডাকাতদের উদ্দেশে হাত নাড়লে সর্বকর্মা।

অধ্যায় উনত্রিশ

সত্যিকারের আশ্চর্য এক জাহাজ

চওড়া নীল নদীর প্রশান্ত উপকূলে ছুটে গেল আমাদের দুই বন্ধু।

পতাকা-নিশানে সাজানো এক মস্তো বাহারে নৌকো ভাসছিল ঠিক নদীর মাঝখানটিতে, ঠিক তার ওপর দিয়েই গেছে রামধনু সাঁকোটা। বাতাসে ফুরফুর করছে ঝলমলে পতাকাগুলো, ঝুমঝুমি বাঁধা তাতে, মৃদু ঠুনঠুন শব্দ হচ্ছে।

নৌকোয় বসেছিল কলকণ্ঠ এক পাল ছেলে, হাত নাড়ছিল তারা, নদীর এপার-ওপার ভরে তুলছিল কলরবে।

'আমায় ওইটে দিন, ওই যে লাল চিমনি!'

'আমি নেব ওই শাদা স্টিমারটা। ওইটেই সবচেয়ে জোরে চলে!'

'আমায় ওই দুই চিমনিওয়ালা কালোটা...'

নাবিকের মতো দেখতে গোঁপওয়ালা একজন বয়স্ক লোক ডাণ্ডায় বাঁধা সাধারণ

জাল দিয়ে ছেঁকে তুলছিল এক একটা কলের জাহাজ, জল ঝেড়ে ছেলেদের হাতে দিচ্ছিল যার যেটা পছন্দ। গোটা নদীটাই ছেয়ে গেছে কলের জাহাজে। নানান দিকে ছুটছে সেগুলো, ঢেউয়ে দুলছে, ভোঁ দিচ্ছে, ধোঁয়া ছাড়ছে চিমনি দিয়ে।

রামধনু সাঁকো আর নদীতীর থেকে আরো সব ছেলেপিলে অধীর হয়ে তাকিয়ে ছিল নৌকোটার দিকে।

'এবার আমাদের পালা! এবার আমরা বাছব!' চেঁচামেচি করছিল তারা, 'আমাদের নিতে কখন যে আসবে নৌকোটা?'

কিন্তু এদের মধ্যে প্রুতিককে পাওয়া গেল না। হয়তো নৌকোয় আছে। কিন্তু নৌকোটা এত দূরে যে তীর থেকে ভালো দেখা যায় না।

'প্রুতিয়া-য়া-য়া!' সমস্বরে চ্যাঁচাল পেন্সিল আর সর্বকর্মা।

কোনো জবাব এল না। কেউ তাদের খেয়ালও করলে না। সবাই তাকিয়ে আছে নৌকোটার দিকে। রঙীন বিজ্ঞাপন ঝুলছে তাতে:

ভাসমান দোকান

কলের জাহাজ বিক্রয় হয়

'শোন পেন্সিল,' প্রস্তাব দিলে সর্বকর্মা, 'তুই একটা জাহাজ আঁক। প্রুতিক যদি নৌকোয় থাকে, তাহলে জাহাজটা ওর চোখে পড়বে, অমনি তীরে আসতে চাইবে।'

'ঠিক বলেছিস,' বললে পেন্সিল, 'তাই করা যাক। তবে আঁকব কোথায়? জাহাজ রাখতে হবে জলে, আর জলের ওপর তো আঁকা যায় না। একটা উপায় ঠাওরা।'

'ঠাওরেছি। প্রথমে একটা দড়ি আঁক। পাড়ের ওপর আমি থাকব, দড়ি বেঁধে তোকে নিচে জলের কাছে নামিয়ে দেব। তুই আঁকবি সোজা পাড়ের গায়ে। যুদ্ধ জাহাজ আঁকিস। কামান থাকা চাই। সব ছেলেই কেন জানি কামানের খুব ভক্ত...'

দড়ি আঁকলে ক্ষুদে পটুয়া, সর্বকর্মা তা বাঁধলে পেন্সিলের কোমরে, পেন্সিলও নদীতীরের প্যারাপেট ডিঙিয়ে নেমে গেল নিচে।

সর্বকর্মা রইল পাড়ে।

পেন্সিল যে আঁকছিল সেটা কেউ দেখতে পায় নি। কিন্তু নদীর জলে যেই দেখা গেল এক আশ্চর্য সুন্দর পাল-তোলা জাহাজ, অমনি তীরের নৌকোর সাঁকোর

ওপরকার সমস্ত ছেলেপিলে একবাক্যে বিস্ময়ের ধ্বনি দিয়ে উঠল, নৌকোটাও পাড়ি দিলে তীরের দিকে।

'আরে দ্যাখ, দ্যাখ! জাহাজ!'

'কার জাহাজ? কার?'

'আমি জানি। নিশ্চয় এখানে সিনেমা তোলা হবে।'

'কিসের সিনেমা?'

'নাবিকদের নিয়ে!'

'সত্যি?'

'নিশ্চয়!'

'হ্যাঁ, একেই না বলে জাহাজ!'

জাহাজটা দেখার জন্যে তাড়া পড়ে গেল সবার মধ্যে।

ঠিক নদীর পারেই নতুন এক উঁচু বাড়ি তুলছিল মজুরেরা। তার ওপর থেকে সবকিছুই ভালো দেখা যায়।

'দ্যাখো, দ্যাখো,' বললে মজুরেরা, 'সত্যিকারের পাল-তোলা জাহাজ বানিয়েছে কোন এক ওস্তাদ। নিশ্চয় বাচ্চাদের জন্যে। বাহবা দিতে হয়।'

জাহাজের পালগুলো নামানো। লোহার শেকলে বাঁধা নোঙর জলে ফেলা। সত্যিকারের পেতলের কামানগুলো ঝকমক করছে রোদ্দুরে। আর জাহাজের গলুইয়ের ওপর সোনার হরফে লেখা আছে:

'প্রুতিক'

বাহারে নৌকোটা এসে ভিড়ল জেটিতে। ব্যাঙের মতো চটপট লাফিয়ে নেমেই ছেলেগুলো ছুটে গেল আজব জাহাজ দেখতে।

কিন্তু প্রুতিককে তাদের মধ্যে পাওয়া গেল না।

নাবিকের মতো দেখতে মোচওয়ালা লোকটা একলা পড়ে রইল তার নৌকোয়। অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে সে হতাশে হাত নেড়ে মাস্তুলের গায়ে টাঙিয়ে দিলে একটা ছোট্ট ফলক:

দোকান বন্ধ

'ছোঃ, জাহাজ দেখল সব আদেখলে! জাহাজ, সে দেখেছি আমরা। যে কালা পানি পাড়ি দিয়েছি তার কাছে এই নদী!' তীরে উঠতে উঠতে বিড়বিড় করছিল সে।

'আচ্ছা, প্রতিককে দেখেন নি আপনি?' জিজ্ঞেস করলে পেনসিল।

'তা অমুক তমুক কোন জাহাজে কাজ করে তোমাদের প্রতিক সেটা বলো?' সিগারেটে টান দিয়ে জলদ গলায় জিজ্ঞেস করলে সে।

'সে কি, চাকরি করছে নাকি?' ভ্যাবাচ্যাকা খেলে পেনসিল, 'ও যে কিশোর টেকনিশিয়ান...'

'আহ্, কিশোর টেকনিশিয়ান? তাহলে সবই পরিষ্কার যেন একেবারে কুয়াশা। রোজ আমি হাজার দুয়েক করে কিশোর টেকনিশিয়ান দেখি, তাদের প্রতি তিনজনেই নিশ্চয় একজন প্রতিক।'

'এ্যাঁ?' কিছুই বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলে পেনসিল।

'যাক গে ভায়ারা, ঠাট্টা করছিলাম। তোমাদের প্রতিককে যদি ধরতে চাও, তাহলে কাল যেও বাসন্তী সরণিতে। ঠিক দুপুরে শুরু হবে কিশোর টেকনিশিয়ানদের প্যারেড। কেন প্যারেড, সেটা নিজেরাই তোমরা কাল দেখবে। তোমাদের প্রতিক যদি কিশোর টেকনিশিয়ান হয়, তাহলে নিশ্চয় সেখানে থাকবে।'

'ধন্যবাদ,' বললে দু'বন্ধু, যদিও খুব খুশির মেজাজে নয়, 'কিন্তু বাসন্তী সরণি কোথায় তা যে আমরা জানি না।'

'দেখেই বোঝা যায় এখানকার লোক নও। বেশ, তাহলে তোমাদের সব বুঝিয়ে বলা যাবে। তোমাদের আপত্তি না থাকলে চলো আগে যাওয়া যাক জাহাজী ক্যান্টিনে, কিছু খাওয়া যাক। খিদে পেয়েছে।'

নদীর তীরেই ছোটো একটা কাফেতে সে নিয়ে গেল তাদের।

আর নদীর তীর ধরে লোকে যাচ্ছিল অদেখা ওই জাহাজটাকে দেখতে।

ছেলেপিলেরা স্রেফ রেলিঙ ধরে ঝুলছিল।

তীর থেকে কাঠের হালকা মই-পাটাতন পাতা যেত জাহাজটা পর্যন্ত। অমন টলমলে পাটাতন বেয়ে যেতে পারে অবিশ্যি কেবল অভিজ্ঞ নাবিকেরাই।

কিন্তু ছেলের দলে অভিজ্ঞ নাবিক যে কেউ ছিল না।

অধ্যায় তিরিশ

ফের দুই ছোট্ট ঘোড়া

ছোট্ট ঘোড়াদুটো আগের মতোই দাঁড়িয়ে ছিল চিড়িয়াখানার ফটকের কাছে। পার্টাকিলে লেজ নাড়ছিল তারা সখেদে, তাকাচ্ছিল কৌতূহলী পথচারীদের দিকে, কিন্তু কোনো কথাই বলছিল না। কৌতূহলী পথচারীরা কিন্তু ঘোড়া দেখে দিব্যি কথা বলছিল।

'কার ঘোড়া?' জিজ্ঞেস করছিল ট্র্যাফিক-পুলিস।

'নিশ্চয় বুনো ঘোড়া,' বললে কে একজন।

আর চিড়িয়াখানার ভেতর থেকে ছুটে এল চশমা-পরা লালচে-গাল এক লোক।

'কই, কোথায় ঘোড়া? দেখান তো। পথ দিন কমরেড, আমি চিড়িয়াখানার ম্যানেজার।'

'দেখছেন তো। উনি ম্যানেজার! আর জন্তুগুলো ছুটে আসছে। দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায়।'

'জন্তু কোথায় মশায়? এ তো ঘোড়া। বাহ্, কী সুন্দর ঘোড়া! এ জাতের ঘোড়া সহজে মেলে না। খুব কম মেল... আহা বেচারি খিদেয় মরছে।'

'যাচ্ছেতাই ব্যাপার!' বললে কে একজন, 'ঘোড়াগুলো খিদেয় মরছে, আর উনি ম্যানেজার খেতাব নিয়ে বসে আছেন! উনি ম্যানেজার, ঘোড়াগুলো ওদিকে অনাহারী!'

'খবরের কাগজে লেখা দরকার। অমনি ছেড়ে দেওয়া চলবে না।' ঘোড়ার জন্যে টাটকা নরম রুটি এগিয়ে দিয়ে মন্তব্য করলে একজন পথচারী।

আর দ্বিতীয় আরেকজন পথচারী অন্য ঘোড়াটার গলায় ঝুলিয়ে দিলে রুটি ভরা পুরো একটা থলে।

'ঘোড়াদুটোকে আমি নিচ্ছি,' সোজা সাপটা জানিয়ে দিলে ম্যানেজার, 'এ ঘোড়া কেউ দেখতে চাইলে চিড়িয়াখানায় আসবেন। বাচ্চা ছেলেরা ওর পিঠে চেপে বেড়াবে বিনা পয়সায়!'

কাঁচের বাক্সের মতো গুমোট শো-উইনডো থেকে ডাকাতদের চোখে পড়ল ঘোড়া চলে যাচ্ছে চিড়িয়াখানায়।

'এ যে ডাকাতি!' চেঁচিয়ে উঠল জলদস্যু, 'আমাদের ঘোড়া! আমাদের নিজস্ব!' গাল পাড়তে শুরু করল সে, কিন্তু কারো কানে তা গেল না।

কেলে-ছোপ ছাড়া ডাকাতদের দিকে আর কেউ তখন তাকাচ্ছিল না। শো-উইনডোর কাছে ধৈর্য ধরে বসে ছিল সে, মাঝে মাঝে ঘেউ-ঘেউ করছিল পথচারীদের উদ্দেশে।

শো-উইনডোর দরজার কী একটা গোঁ-গোঁ করে উঠল, খট করে উঠল তালা, দরজা খুলে হাতে ভ্যাকুয়ম ক্লিনার নিয়ে ভেতরে ঢুকল জমাদারনী।

'মা গো! এখানে তোরা ঢুকলি কেমন করে? সব একেবারে লণ্ডভণ্ড করে রেখেছে। এক্ষুনি পুলিস ডাকছি।'

'ইচ্ছে করে নয়, হঠাৎ হয়ে গেছে!' করুণ কণ্ঠে বললে ডাকাতরা, 'আর কখনো করব না!'

'আর তুই ছুঁড়ি, লজ্জা হওয়া উচিত! তেমন ছোটোটি তো আর নস,' খুকির পোষাক-পরা গুপ্তচরকে বললে জমাদারনী।

'ভ্যাঁ-া-া' কেঁদে উঠল সিংধেল।

'কাঁদিস না বাপু। ছেলেপিলেদের কান্না আমি একেবারে সইতেই পারি না। নে পালা, আর যেন না হয়। মা হয়তো তোর পথ চেয়ে বসে আছে।'

দোকান থেকে লাফিয়ে বেরল ডাকাতরা। জোরে ডেকে উঠল কেলে-ছোপ স্তম্ভিত জমাদারনীকে কাঁচকলা দেখালে গুপ্তচর এবং সবাই পিটটান দিলে।

পেনসিল আর সর্বকর্মার গন্ধ শুঁকে শুঁকে কেলে-ছোপ ডাকাতদের নিয়ে এল প্রশান্ত উপকূলে।

অধ্যায় একত্রিশ

'ডাইনে স্টিয়ারিং!' 'বাঁয়ে স্টিয়ারিং!'

জাহাজ! 'প্রুতিক' নাম লেখা জাহাজটা দেখে উল্লসিত হয়ে উঠল জলদস্যু, সত্যিকারের জাহাজ! কার জাহাজ? দখল করতে হবে! মারো লাফ! চলো হামলায়! আমার পেছু পেছু! হুররে!..' বললে বটে, তবে কেন জানি নিজেই নড়বার কোনো লক্ষণ দেখালে না।

কত ভিড় চারিদিকে! কত ছেলেপিলে! জনকয়েক পাহারাওয়ালাও দেখা গেল।

শুধু প্রভুভক্ত কেলে-ছোপ ছুটে যাবার জন্যে টান দিলে তার শেকলে। শেকলটা ছিল খুকির ছদ্মবেশে সিংধেলের হাতে।

'বুঝতে পেরেছি,' বললে সিংধেল, 'এ জাহাজ এঁকেছে ওই পাজি পেনসিলটা। এখন ওখানে কেউ নেই। কী করে ওঠা যায় ওখানে?'

'দ্যাখ, দ্যাখ, ওই যাচ্ছে জাহাজের ক্যাপটেন!' ডোরাকাটা গেঞ্জি-পরা জলদস্যুকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল ছেলেপিলেরা।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমিই ক্যাপটেন! আমিই ক্যাপটেন,' খুশি হয়ে উঠল জলদস্যু, 'নাও, এবার পথ ছাড়ো! ক্যাপটেন এসেছি!'

সিঁড়ি বেয়ে দস্যুরা ছুটে উঠল জাহাজে।

'হুররে!' হাঁকরে উঠল জলদস্যু, 'জাহাজ! আমার জাহাজ! হুররে! হিররে কারাম্বে!' দুর্বোধ্য কয়েকটা ডাক ছাড়লে সে।

সত্যিকারের জলদস্যুরা সবাই জাহাজে দুর্বোধ্য কিছু আওয়াজ করে, নইলে সে আবার কিসের জলদস্যু!

'বাঁয়ে ঘোরাও! ডাইনে ঘোরাও!' চেঁচিয়ে উঠল জলদস্যু, 'কারাম্বে! হিররে! ক্যাস্টর-অয়েল!.. ডান স্টিয়ারিং, বাঁ স্টিয়ারিং!'

'বাঁ স্টিয়ারি-ঙ!' সায় দিলে উল্লসিত ছেলেগুলো।

'হুররে!' ধ্বনি দিলে জলদস্যু।

'হুররররে!' সাড়া দিলে চারিপাশের ছেলেরা, 'বাঁয়ে হাল! পুরাদমে সামনে!'

'আরে হুকুম দিচ্ছে কে?' টনক নড়ল জলদস্যুর। ছেলেপিলেদের দিকে তাকিয়ে দেখে সে হাত নেড়ে তাদের চলে যেতে বললে, 'হটে যাও সবাই, চলে যাও, দেখবার কিছু নেই!'

'সত্যিই তো,' বললে পাহারাওয়ালারা, 'কাজ করছে ওরা ব্যাঘাত ঘটাবেন না।'

বড়োরা চলে গেল যে যার কাজে। আর মা-বাপেরা ছুটে এসে নিয়ে গেল তাদের ছেলেপিলেদের।

'খুকিকে উঠতে দিয়েছে অথচ আমাদের নিচ্ছে না,' খুকির ছদ্মবেশে গুপ্তচরের দিকে আঙুল দেখিয়ে কলরব করলে ছেলেরা।

নদীতীর যখন ফাঁকা হয়ে গেল, জলদস্যুরা তখন গলুয়ের ওপর তুলে দিলে তাদের হাড়-আঁকা বোম্বেটে পতাকা।

পতাকাটা সব দস্যুরই প্রিয়। কেলে-ছোপেরও ভালো লেগে গেল শাদা হাড়গুলো।

অধ্যায় বত্রিশ

পশ্চাদনুসরণ

জাহাজের কেবিনে জলদস্যুরা বসলে সামরিক বৈঠকে।

'পেনসিল ব্যাটাকে না ধরা পর্যন্ত আমরা মহাসাগরে পাড়ি দিতে পারি না।'

'লোহার সঙ সর্বকর্মার ঘাড় না মুচড়ে আমি কোথাও যাচ্ছি না।'

'ধরতে হবে!'

'পাকড়াতে হবে! ইস্ক্রুপ খুলে নিতে হবে!'

এই সব আলাপ চলছিল দস্যুদের।

'শোন সিঁধেল,' বললে জলদস্যু, 'তুই নামকরা গুপ্তচর। তুই ওদের পেছনে টিকটিকি লেগে থাকবি। তুই কেলে-ছোপ শুঁকে বার করবি। আর আমি পাকড়াও করব। লুট করব বন্দী করে!'

কেলে-ছোপকে নিয়ে দস্যুরা নামল তীরে।

রাস্তা শুঁকতে শুঁকতে কেলে-ছোপ ছুটল আগে। তারপর ডাস্টবিনের কাছে থেমে এক জায়গায় ঘুরপাক খেতে লাগল।

'বোঝা যাচ্ছে,' বললে গুপ্তচর, 'ওরা এইখেনে দাঁড়িয়ে ছিল।'

পকেট থেকে আতশী কাঁচ বার করে সে মন দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল রাস্তাটা।

'কারো সঙ্গে ওরা এখানে কথাবার্তা বলেছিল,' জানালে সিঁধেল, 'দশ নম্বর বুট জুতোর দাগ দেখতে পাচ্ছি। ভেজা দাগ। পাশেই ছাই পড়ে আছে। তামাকের ছাই।'

ডাস্টবিনটার দিকে চাইলে গুপ্তচর, উল্টে ফেললে সেটাকে। পাওয়া গেল একটি মাত্র পোড়া সিগারেটের টুকরো। গুপ্তচর সেটাকে দেখতে লাগল আতশী কাঁচের ভেতর দিয়ে।

'দশ নম্বর বুট জুতোর মালিক খেয়েছে "জাহাজী" সিগারেট।'

'অসম্ভব! সত্যিকারের নাবিক এখানে ছিল নাকি?' জিজ্ঞেস করলে জলদস্যু।

'এগো!' বললে গুপ্তচর।

কেলে-ছোপ অধৈর্যে টান দিলে শেকলে।

ছুটল তারা নদীতীরে খাটানো মস্তো এক শামিয়ানার দিকে।

শামিয়ানার ভেতরে শাদা শাদা টেবিল, মৃদু বাজনা বাজছে। শামিয়ানার ভেতর

থেকে ভেসে এসে সারা তীরে ছড়িয়ে পড়েছে ভাজা সসেজের মতো জিভে জল আসার একটা ভারি মিষ্টি গন্ধ।

শামিয়ানার ভেতরে কেউ নেই।

ঠোঁট চেটে এদিক ওদিক চেয়ে ভেতরে ঢুকল দস্যুরা। কেলে-ছোপ কোণের দিকে চলে গিয়ে পাক খেতে লাগল একটা শূন্য টেবিল ঘিরে।

'ওইখানে খাওয়া-দাওয়া করেছে ওরা।' সিদ্ধান্ত টানলে গুপ্তচর।

'কিন্তু কী খেয়েছিল?' খিদেয় ঠোঁট চাটতে লাগল জলদস্যু, 'কী ধরনের খাবার?'

টেবিলের নিচে ঢুকল গুপ্তচর। কিন্তু খাবারের উচ্ছিষ্ট কিছু খুঁজে পেলে না।

জলদস্যু কিন্তু ততক্ষণে পেন্সিল আর সর্বকর্মার কথা ভুলে বসেছে। অন্য একটা টেবিলের দিকে সলোভে তাকিয়ে ছিল সে। তার ওপর ঝকমক করছে প্লেট, তাতে শাদা আর বাদামী রুটি, আছে মাংসের ভাজা কাটলেট-ভরা একটা তপ্ত পাত্র, আলু ভাজার সঙ্গে মুরগীর মাংস, সেই সঙ্গে গরম, সুবাসিত সুপ। সেই সঙ্গে আছে চিনির রসে সেদ্ধ ঠাণ্ডা চেরি, আর টকমিষ্টি সরবত।

পাশেই বাহারে ন্যাপকিন, তাতে এই কথাগুলো শেলাই করা:

'নমস্কার!

সংকোচ না করে বসুন, ভাবুন যেন নিজের বাড়ি।

নিজেই গরম সুপ ঢেলে নিন,

পছন্দমতো নিন দ্বিতীয় কোর্স আর অন্যান্য যা ভালো লাগে।

খাবারের দাম

ফেলে দিন নীল বাক্সটার ফুটোয়।

কষ্ট না হলে এঁটো বাসন-পত্র রেখে দিন

ওয়াশ বেসিনের কাছে আলমারিটায়।

আপনা থেকেই বাসন ধোয়া হয়ে যায় ওখানে।

কুশল হোক!'

খাবারের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল দস্যুরা। গেলবার যা কিছু ছিল, মুহূর্তের মধ্যেই তা সব উদরস্থ হল তাদের, মেঝের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেললে বড়ো বড়ো হাড়, আধ-খাওয়া উচ্ছিষ্ট। তাতেও হল না, এঁটোয় মাখামাখি হাত মুছে নিল টেবিল ক্লথে, আর দাম রেখে যাবার নীল বাক্সটার দিকে কলা দেখালে গুপ্তচর।

পড়ি-মরি ছুটে পালাল তারা শামিয়ানাটা থেকে।

গুপ্তচর আর দস্যু কেবলি পেছন ফিরে ফিরে দেখছিল, আর কেলে-ছোপ কেবলি তাদের সামনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল পেনসিল আর সর্বকর্মার পদচিহ্ন ধরে।

'ভেউ! ভেউ!' — 'আমার পেছু পেছু,' বলতে চাইছিল কুকুরটা।

অধ্যায় তেত্রিশ

শিশুর দলে দস্যু

কেলে-ছোপ ওদের নিয়ে এল পাতাল রেলের একটা স্টেশনে, দেখে মনে হয় যেন একটা কাঁচের পুরী।

'ঠকিয়েছে আমাদের! পাজিদুটো মাটির তলে লুকিয়েছে,' সিদ্ধান্ত টানলে সিঁধেল।

কিন্তু স্টেশনের ভেতরে যেতে পারলে না দস্যুরা, টিকিট ছিল না যে।

'হতচ্ছাড়া সব!' জলদস্যুর ইচ্ছে হয়েছিল প্রকাণ্ড পিস্তলটা বার করে কাউকে না কাউকে খুন করবে রাগের জ্বালায়।

কিন্তু রাস্তার লোকেরা সবাই জোরে জোরে কথা কইছিল, হাসছিল, জলদস্যুকে দেখে কেউ ভয়ই পাচ্ছিল না। এতটুকুনও না। আর দস্যুকে যখন কেউ ভয় না পায়, তখন দস্যুই ভয় করতে থাকে সবাইকে।

স্টেশনে এল বুকের ওপর লাল তারার চিহ্ন দেওয়া শাদা শাদা জামা পরা বাচ্চাদের একটা দল। দলটাকে নিয়ে আসছে বোঁচা-মতো উটকো নাক একটি তরুণী শিক্ষয়িত্রী, 'দিদিমণি'। উচ্ছল একটা গান গাইছিল বাচ্চারা:

আমরা হাসি খুশি অতি!
এক — দুই!
আমরা অক্টোবরের ব্রতী!
এক — দুই!

ছেলেগুলোকে দেখে হাসি ফুটছিল রাস্তার লোকেদের মুখে।

'বেশ, বেশ, চালাও!' বলছিল রাস্তার লোকে, 'শক্ত ধাতের বাচ্চা সব!'

গুপ্তচর সিংধেল ওদিকে চোখ টিপলে জলদস্যুকে, দেখালে গাইয়ে বাচ্চাদের, অলক্ষ্যে দলের সঙ্গে মিশে গেল দুই ডাকাত। মাফলার দিয়ে দাড়ি ঢেকে নিলে ক্যাপটেন টগবগ, গান ধরলে ডাকাতে গলায়:

আমড়া হাস্‌সি খুস্‌সি অতি!
র-রাম — দো!

আর নাকী গলায় ধুয়া ধরলে সিংধেল:

আঁমরা অংক্টোবরের ব্রংতী...

দস্যুরা ভাবলে, ওদের বুঝি ঠিক এই অক্টোবর বিপ্লবের শিশু ব্রতীবালকদের মতোই এখন দেখাচ্ছে, তাই দিদিমণি কিছুই টের পাবে না, একসঙ্গেই ওরা পাতাল ট্রেনে চেপে ঘুরবে।

দিদিমণি কিন্তু চাইতেই দেখতে পেলে জলদস্যুকে।

'এই ছেলে, কে তুই?'

'আমি পেতিয়া,' মিথ্যে করে বললে জলদস্যু।

'কিন্তু তোর গলার স্বরটা অমন কেন?'

'গলায় ব্যথা।'

'ঠেসে আইসক্রীম গিলেছে,' ফোড়ন কাটলে সিংধেল।

ফ্যাকাসে হয়ে গেল দিদিমণির মুখ।

'গলা ব্যথা করছে? শুনছেন আপনারা? ছেলেটির গলায় ব্যথা। অসুখ হয়েছে!!'

'কোথায় অসুস্থ ছেলেটা?' শশব্যস্ত হয়ে উঠল রাস্তার লোক, 'কোথায়?'

'একটা ছেলে অসুস্থ!'

'ছেলেটা রোগে পড়েছে!'

'এক্ষুনি অ্যাম্বুলেন্স ডাকা দরকার!'

'হায়-হায়-হায়, কী সর্বনাশ। অসুখ হয়েছে ছেলেটার!'

থেমে গেল ট্রলিবাস, মোটরগাড়ি, বাস। যাত্রীরা ফ্যাকাসে মুখে উঁকি দিতে লাগল জানলা দিয়ে।

'কী দুঃখের কথা! কী বিপদ! রোগে পড়েছে ছেলেটা!'

কিছুই করার রইল না দস্যুদের। সাইরেন বাজিয়ে ছুটে এল এক শাদা মোটরগাড়ি, হঠাং করে খুললে দরজা। ধবধবে শাদা স্মক গায়ে দুজন লোক জলদস্যুকে স্ট্রেচারে শুইয়ে নিয়ে গেল লাল ক্রস আঁকা শাদা গাড়িটায়।

হাত-পা ছুড়তে লাগল ক্যাপটেন টগবগ, চ্যাঁচাতে লাগল:

'আমি ঠিক আছি, ভালো আছি! যাব না হাসপাতালে, আমি ড-ডাকাত! আমি ক্যাপটেন! সিঁধেল, একটু সাহায্য কর! বাঁচা!'

লোকে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে।

'বেচারি ছেলেটা! অবস্থা ওর খুবই খারাপ! শুনছেন, কেমন ভুল বকছে?'

বন্ধ হয়ে গেল দরজা, বেজে উঠল সাইরেন। জলদস্যু চলে গেল হাসপাতালে।

আর সিঁধেল? ভাবছ বুঝি তার খুব কষ্ট হল? একেবারে উল্টো। আনন্দে হি-হি করে হাসতে লাগল সে:

'ঠিক হয়েছে তোর, ব্যাটা দেড়েল! শুয়ে থাক গে বিছানায়! ক্যাস্টর-অয়েল খা। তোকে ছাড়াই আমি গুছিয়ে নিতে পারব। হি-হি-হি! সব হবে আমার! জাহাজ, পেনসিল — সব! হি-হি...'

লাল হুড পরা এই অদ্ভুত খিলখিলিয়ে হাসা মেয়েটির সঙ্গে বাচ্চারা গেল পাতাল স্টেশনের ভেতরে।

অধ্যায় চৌত্রিশ

ফের ট্র্যাফিক-আইন ভাঙা পায়রা

ঘেউ-ঘেউ করতে করতে কেলে-ছোপ ছুটল শাদা গাড়িটার পেছু পেছু। গাড়ি কিন্তু ছুটছে বিদ্যুৎ-গতিতে, যেন রকেট। সবচেয়ে সোজা রাস্তা ধরছিল ড্রাইভার। অসুস্থ ছেলেটা কিন্তু হাত-পা ছুড়ে চেঁচিয়ে চলল ডাকাতে গলায়:

'যাব না হাসপাতালে, যাব না! আমি ডাকাত!'

যে মাফলারটায় ও জড়ানো ছিল সেটা এলেমেলো হয়ে বেরিয়ে পড়ল প্যাটকিলে দাড়ি। দেখে ডাক্তার থ'।

'দাড়ি!' ফ্যাকাসে হয়ে উঠল ডাক্তার, 'বাচ্চার দাড়ি বেরিয়ে গেছে। এ আবার কোন নতুন রোগ! জলদি হাসপাতাল!'

কিন্তু শাদা গাড়িটা যেন ইচ্ছে করেই নিশ্চল হয়ে গেল।

'জলদি!' তাড়া দিলে ডাক্তার, 'জলদি!'

'অসম্ভব!' ফ্যাকাসে হয়ে ড্রাইভার দেখালে রাস্তার দিকে, 'পায়রা! রাস্তা জোড়া পায়রা। যেতে দিচ্ছে না!'

'ভাসিয়া!' ককিয়ে উঠল ডাক্তার, 'তাড়না-পাখসাট সঙ্গে নিস নি কেন?'

'আমারই দোষ। ভুলে গিয়েছিলাম...'

'দুঃখের কথা ভাসিয়া, কিন্তু শাস্তি তোকে পেতেই হবে।'

গাড়ি থেকে নেমে ডাক্তার পায়রা তাড়াতে লাগল:

'হুস! হুস! হুস!'

জলদস্যুও অমনি আধ-খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেল রকেটের মতো। দেড়েল শিশু কোন গলিতে সেঁধল সেটা নজর করারও ফুরসুত হয় নি ডাক্তারের। মোটরগাড়ির চারিপাশে নিশ্চিন্তে পায়রাগুলো আড্ডা জমিয়েছে, ডাক্তারের বিলাপ, ভাসিয়া, শাদা গাড়িটার দিকে ভ্রূক্ষেপও করলে না কেউ।

অধ্যায় পঁয়ত্রিশ

আঁকা বারণ

কিন্তু কোথায় আমাদের ছোট্ট বন্ধুরা — হাসিখুশি পেনসিল আর ওস্তাদ সর্বকর্মা?

নাবিকের মতো দেখতে গুঁপো মানুষটা, সেই যে-লোকটা কলের জাহাজ বিক্রি করছিল, পেনসিল আর সর্বকর্মাকে ভালো করে খাইয়ে দাইয়ে সে তাদের সঙ্গে আসে ভূগর্ভ রেলের স্টেশনে। বললে, 'দেখেই বোঝা যাচ্ছে তোমরা ভায়া নতুন লোক। তাই আমাদের পাতাল রেলটা দেখে যাও।'

লম্বা এক চলন্ত আজব-সিঁড়িতে চেপে তারা নেমে এল মাটির তলাকার স্টেশনে, ঘুরে বেড়াতে লাগল সটান-লম্বা এক নীল ট্রেনে চেপে।

নাবিকের মতো দেখতে গুঁপো লোকটি তার ছোট্ট বন্ধুদের করমর্দন করে বিদায় নিয়ে নেমে গেল তকতকে গলি স্টেশনে।

আর পেনসিল আর সর্বকর্মা ছুটে গেল মাটির তলাকার প্রাসাদ দেখতে। আনন্দে হাসতে লাগল তারা, লাফালাফি করলে হাততালি দিয়ে।

'ওহ, কী সুন্দর!' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সর্বকর্মা।

'আহ, কী সুন্দর!' বললে পেনসিল, 'এখানকার সবকিছু আমার খুব-উব ভালো লাগছে! এখানে আমি এঁকে দেব জীবন্ত নারকেল গাছ, সত্যিকারের সোনালী মাছে ভরা ফোয়ারা, জীবন্ত সব ফুল। আঁকবই আঁকব!'

দেয়ালের গায়ে প্রথম রেখাটা পর্যন্ত এঁকেছিল সে, কিন্তু কড়া এক মাসি রেগে জানিয়ে দিলে:

'ওহে ছোকরা, দেয়াল নোংরা করবে না। এক্ষুনি মুছে ফ্যালো!'

'আঁকা দরকার রাত্রে, যখন কেউ থাকবে না,' বললে চালাক-চতুর সর্বকর্মা।

'ঠিক বলেছিস্। রাতেই আঁকব,' চোখ টিপলে পেনসিল।

সেই জন্যেই সর্বকর্মা আর পেনসিল গাড়ি চেপে বেড়াল রাত পর্যন্ত। নামছিল ওরা প্রত্যেক স্টেশনে, অন্য কোনো ট্রেন ধরছিল, চলে যাচ্ছিল কে জানে কোথায়, এতটুকু সন্দেহও করে নি যে তাদের পেছু নিয়েছে কেউ, খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের একগুঁয়ে গুপ্তচর সিঁধেল।

অধ্যায় ছত্রিশ

সবচেয়ে ভয়াবহ

বলো তো দেখি: দুনিয়ার কোথায় রাত সবচেয়ে ছোটো? যতই ভাবো, চট করে উত্তর দিতে পারবে না। সবচেয়ে ছোটো রাত হল মাটির তলাকার ট্রেনে।

ওপরে, পৃথিবীতে রাত নেমেছে। মাটির তলাকার রেলে কিন্তু তখনো সব দিনের মতোই আলোয় আলো। শুধু একটু চুপচাপ।

তারপর সুড়ঙ্গ দিয়ে শেষ ট্রেনটি ছুটল স্টেশন থেকে স্টেশনে। ফাঁকা ওয়াগনে মধুর তন্দ্রায় ঢুলছে কেউ কেউ। এমনকি অঘোরেই ঘুমচ্ছে ছোট্ট একটি মানুষ। মাথা পর্যন্ত সে রেন-কোট মুড়ি দিয়েছে। বেরিয়ে আছে শুধু লম্বা ফ্যাকাসে নাকখানা, কেমন একটা সন্দেহজনক আওয়াজ বেরচ্ছে সেখান থেকে: 'ফোঁস, ফোঁস! ধরব রোস!'

তবে ওটা হয়তো আমাদের কানের ভুল। ছোট্ট লোকটি স্রেফ ঘুমচ্ছিল। চেয়ে দ্যাখো-না এই মানুষটিকে। ঘুমচ্ছে বৈকি।

গাড়ির ওদিকে ভারি তাড়া। দেখতে না দেখতে আরো কয়েকটা স্টেশন পেরিয়ে গেল তা। মাইকে ঘোষণা হল: 'গাড়ি আর যাবে না। মেট্রো বন্ধ হচ্ছে। ফের দেখা হবে। শুভ রাত্রি!'

পেনসিল আর সর্বকর্মা গাড়ি থেকে নেমে চুপি চুপি ঢুকে পড়ল কোন একটা বেঞ্চির নিচে, মুখে কথাটি নেই।

স্টেশনটা ছোটো শহরের সন্ধ্যার রাস্তার মতো আঁধার-আঁধার। জ্বলজ্বলে বাতিগুলো নিভে গেছে। যেগুলো জ্বলছে, সেগুলোর আলোর জোর নেই। তাই দুই বন্ধুর কারসাজি কারো চোখে পড়ে নি। কারো না, শুধু... তবে এখনো তো জানা নেই কে ওদের দেখেছিল।

ওভার-অল পরা জমাদারনীরা এল স্টেশনে। জল দেবার যন্ত্র চালালে তারা, অটোমেটিক ঝাঁটা, ধোয়া পাকলা করলে অনেকক্ষণ ধরে, মুছে তুললে স্টেশন। তারপর চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল ওপরে।

ওদের পর সিঁড়িটা হয়ে গেল ফাঁকা। ফিটার সেটাকে থামিয়ে স্টেশন তালা বন্ধ করে চলে গেল বাড়ি।

ভেতরে জ্বলছিল কেবল রাতের আলোগুলো।

'এইবার!' পেনসিলকে বেঞ্চির তল থেকে বার করে আনলে সর্বকর্মা।

'উহ্, কী অন্ধকার! ছমছমে!'

'ছমছমে!' পুনরুক্তি করলে কে যেন।

'মাগো!' শিউরে উঠল পেনসিল।

'মাগো!' বললে কে যেন।

'ভয় নেই,' বললে বুদ্ধিমান সর্বকর্মা, 'এ আর কিছুই নয় — প্রতিধ্বনি। ভয় পাস নে।'

'ভয় পা! ভয় পা!' বললে প্রতিধ্বনি।

'ভয় লাগছে রে,' ফিসফিস করলে পেনসিল।

'ওদিকে মন দিস না,' বললে সর্বকর্মা, 'নে, আঁকা শুরু কর।'

ক্ষুদে পটুয়া রঙ পেনসিলের জন্যে হাত ঢোকাল পকেটে।

'এবার বাছাধনেরা, পেয়েছি! অনেকক্ষণ থেকে ঘুরছি তোমাদের পেছনে!'

বুঝতে পারছ, এ হল গুপ্তচর সিঁধেল।

জমাদারনীরা যখন মেঝে ধুচ্ছিল, ও তখন বসেছিল পাশের বেঞ্চিটার নিচে।

'হ্যান্ডস্ আপ!' পিস্তল তুলে চেঁচিয়ে উঠল সিঁধেল।

'চল, পেনসিল, ছুটি!'

পেনসিলের হাতে ঝাঁকুনি দিলে প্রত্যুৎপন্নমতি সর্বকর্মা।

'থামো, নইলে গুলি চালাব!' হাঁকলে সিঁধেল।

'গুড়ুম!' গর্জে উঠল গুলি, 'গুড়ুম!'

গুলি লাগল রাতের বাতিটায়, চুরমার হয়ে গেল তা। স্টেশন হয়ে উঠল প্রায় একেবারে অন্ধকার আর ভারি ভয়ংকর।

'আয় চটপট দৌড় দিই,' বলে উঠল সর্বকর্মা।

রেল লাইনের ওপর লাফিয়ে পড়ে তারা ছুট লাগালে অন্ধকার টানেল দিয়ে, দিনের বেলা যার ভেতর দিয়ে গাড়ি চলাচল করছিল অমন ফুর্তিতে।

'আরে চললি কোথায়? দাঁড়া, দাঁড়া! আমি যে রগড় করছিলাম। হা-হা-হা! ঠাট্টা! ক্যাপটেন তোদের সেলাম জানিয়েছে। দাঁড়া! এ-এ-এই! কোথায় তোরা?' চেঁচাতে লাগল সিঁধেল, দুই বন্ধুর ছুটে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল সে।

একটু সরে দেখতে যেতেই অন্ধকারে সে পা ফসকে পড়ে গেল প্ল্যাটফর্ম থেকে নিচে।

'হতচ্ছাড়া!' কঁকিয়ে উঠল সিঁধেল।

'...ছাড়া!' সজোরে ফিরে এল প্রতিধ্বনি।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে পিস্তল আস্ফালন করতে লাগল গুপ্তচর।

'জলদি, পেনসিল, জলদি!' তাড়া দিলে সর্বকর্মা।

টানেলের ভেতর বাতি মাত্র একটা দুটো। কোথায় যেন পেছনে ছুটছিল সিঁধেল, চ্যাঁচাচ্ছিল:

'ছাড়ছি না তোদের, পাজি কোথাকার!'

এই ভাবেই তারা মাটির তলেকার ছোট্ট রাতটা গোটাই পাড়ি দিয়ে পৌঁছল পরের স্টেশনে।

ওপরে তখন খুব ভোরে স্টেশনে এসেছিল ফিটার। সর্বকর্মা আর পেনসিল যখন একের পর এক সিঁড়ি ডিঙিয়ে (রাতে সিঁড়ি চলে না) ওপরে উঠছিল, ঠিক সেই সময়ই সে পকেট থেকে চাবি বার করে খুলছিল স্টেশনের পেল্লাই দরজাটা।

সিঁধেল লাফিয়ে আসছিল তাদের পেছন পেছন, চেষ্টা করছিল কোনো একজনের ঠ্যাঙ চেপে ধরতে।

'আরে দাঁড়া!' মিনতি করলে সিঁধেল, 'দাঁড়া, বলছি! স্টেশন তো বন্ধ! পালাবি

কোথায়? কোথাও যাবার উপায় নেই। ছুটিস না তো বাপু, বিচ্ছু চ্যাংড়া, দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার। উহ্, একেবারে হাঁপিয়ে গিয়েছি, উহ্!'

হয়রান হয়ে গুপ্তচর সিঁড়ির শেষ পৈঠায় বসল একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে।

ফ্যাকাসে পেন্সিল আর মনমরা সর্বকর্মা দাঁড়িয়ে রইল তার সামনেই। পালাবার জায়গা নেই কোথাও।

'এইবার দফা শেষ,' ভাবলে পেন্সিল।

'হি-হি-হি! হি-হি-হি!' খুশি হয়ে উঠল সিঁধেল, 'উহ্, কী হাঁপিয়ে গেছি। একটু বসা যাক। আলাপ করা যাক এটা সেটা। উহ্, তোদের জন্যে এত কষ্ট হচ্ছে, হি-হি-হি! আর এই তুই ঢন-ঢনে টিনের কোটো, তোর ইস্কুপ খুলে নিয়ে টুকরো টুকরো করব।'

স্ক্রু-ড্রাইভার দেখাল সে, সর্বকর্মা যখন তাড়না-পাখসাট বানাচ্ছিল তখন মিস্ত্রির কাছ থেকে যেটা সে মেরে দিয়েছিল।

হঠাৎ আলোয় ঝলমল করে উঠল স্টেশন। সুইচ টিপেছিল ফিটার।

আর নিশ্চল যে সিঁড়িটায় বসেছিল সিঁধেল, আচমকা সেটা নামতে লাগল নিচে।

'কী বিদ্ঘুটে ঠাট্টা রে বাপু!' চটে উঠল সিঁধেল, 'থামাও! বাঁচাও! পুলিস, পুলিস!'

আজব-সিঁড়ি কিন্তু ডাকাতকে নামিয়ে দিলে একেবারে নিচে, আমাদের দুই হয়রান বন্ধুদের কাছ থেকে অনেক দূরে।

অধ্যায় সাইত্রিশ

ঘুম ভাঙানো মোরগ

সুন্দর একটা নতুন দিন শুরু হয়েছিল শহরে। ক্লান্ত দুই বন্ধু বেরিয়ে এল রাস্তায়।

'ওহ্, কী ঘুমই না পাচ্ছে,' হাই তুললে পেন্সিল, 'চল, সর্বকর্মা বাড়ি যাই।'

'দাঁড়া,' বললে সর্বকর্মা, 'কোথায় এসে পড়েছি সেটা আগে দেখি।'

গোটা রাস্তাটাই নানা রকম নিশানে সাজানো। স্টেশনে টাঙানো মস্তো এক বিজ্ঞপ্তি:

ছেলেমেয়েরা!

আজ আমাদের শহরে
কিশোর টেকনিশিয়ানদের মহোৎসব।

সমস্ত ছেলেমেয়েই
উৎসবে যোগ দিতে পারবে!
প্রথমে শুরু হবে আঙিনায়, রাস্তায়, গলি ঘুঁজিতে

ভাঙা লোহা-লক্কড় সংগ্রহের
মহা অভিযান।

যে সবচেয়ে বেশি লোহা জোগাড় করতে পারবে,
সে হবে
বিজয়ী!
ঠিক ১২টায় বাসন্তী সরণিতে শুরু হবে

কিশোর টেকনিশিয়ানদের প্যারেড

আর প্যারেডের এক মিনিট পরেই
বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ

খেলাধুলা! সিনেমা! মজাদার বিচিত্রানুষ্ঠান!

'পেনসিল, আমরা এইখানেই থেকে যাই। প্রুতিককে খুঁজে বার করব প্যারেডে।'

'বেশ, তবে এ-এ-ক-টু জিরিয়ে নেওয়া যাক, জেরবার হয়ে গেছি।'

'ঠিক কথা,' বললে লোহার মানুষটি, 'একটু বসা যাক। আমার পা-ও তো লোহার নয়।'

রাস্তার ওপর বসাটা ভালো দেখায় না, তাই গাছপালায় ছাওয়া ছোট্ট একটা স্কোয়ারে গেল তারা, ঝোপের মধ্যে সেঁধিয়ে শুয়ে পড়ল নরম তপ্ত ঘাসের ওপর।

ঘাস দুলছে ফুরফুরে হাওয়ায়, সুড়সুড়ি দিচ্ছে পেনসিল আর সর্বকর্মাকে। গাছে কিচির-মিচির করছে পাখি, যেন ঘুমপাড়ানি গান।

'ঘুউ-উ-ম এসে যাচ্ছে,' করুণ স্বরে বললে পেনসিল।

'আ-আ-মা-রও...'

'কিন্তু প্যারেডের সময় যদি ঘুম না ভাঙে?'

'তা না ভাঙতে পারে।'

'তাহলে কী হবে?'

'একটা অ্যালার্ম ঘড়ি এ'কে দে। দম দিয়ে রাখব, কাঁটায় কাঁটায় ঠিক বারোটায় আমাদের জাগিয়ে দেবে।'

'অ্যালার্ম ঘড়ি আঁকতে তো আমি জানি না।'

'তাহলে একটা মোরগ আঁক।'

'মোরগ? হা-হা-হা...' ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ না খুলেই মৃদু হাসলে পেনসিল।

'ঘুমোস নে বাপু। মোরগ আঁক!'

'ঠাট্টা করছিস। মোরগ আঁকতে যাব কেন?'

'মোরগ বরাবর একই সময়ে ডাকে। আগের কালে মোরগের ডাক শুনেই লোকে সময় ঠিক করত। নে আঁক। ঠিক বারোটায় ডেকে উঠবে, আমরাও জেগে যাব।'

আধ-মিনিট পরেই অঘোরে ঘুমতে লাগল দুই বন্ধু। পাশেই চরে বেড়াতে লাগল রূপ-গরবী অ্যালার্ম ঘড়ি-মোরগ। পোকা-মাকড় খাচ্ছিল খুঁটে খুঁটে, রঙচঙে ঝলমলে লেজ নাড়ছিল থেকে থেকে।

অধ্যায় আটত্রিশ

সিঁধেলের কবলে

মারখাওয়া কুকুরের মতো ক্ষেপে মেট্রো থেকে বেরিয়ে এল গুপ্তচর।

'পাজি! ছুঁচো!' আতশী কাঁচ বার করে গজগজ করলে ও, 'কোথায় পালাল বদমাসদুটো?'

রাস্তাটা নজর করতে লাগল সে, কিন্তু কোনো পদচিহ্ন ধরা গেল না। সকাল বেলাকার প্রথম পথচারীরা অবাক হয়ে দেখছিল তাকে, তাই আতশী কাঁচটা সে পকেটে লুকিয়ে রাখল।

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল মোটর ভ্যান, তাতে লেখা:

'লজেন্স, চকোলেট, আইসক্রীম'

লজেন্স, চকোলেট, আইসক্রীম এবং আরো বেয়াল্লিশ হাজার নানা রকমের মুখরোচক জিনিস নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল উৎসবের জন্যে। ক্ষুধার্ত গুপ্তচর ঈর্ষাভরে তাকিয়ে দেখলে গাড়িটাকে, নাক কোঁচকালে।

'কোঁ-কোঁ,' হঠাৎ শোনা গেল রাগী একটা আওয়াজ। আওয়াজটা এসেছিল ছোট্ট স্কোয়ারটা থেকে।

পা টিপে টিপে সে দিকে এগিয়ে গেল কৌতূহলী সিংধেল, ঝোপটা সরাতেই আনন্দে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল আর-কি, তবে সময় থাকতেই নিজের টুপিটাই গুঁজে দিয়েছিল মুখে।

'হি-হি-হি,' টুপি উগড়ে ফিসফিস করলে সিংধেল, 'এইখানে তাহলে! একেবারে তৈরি, যেন ডিশে দেওয়া খাবার। এবার আর আমার হাত ছাড়াতে হচ্ছে না। ঘুমোও বাছাধনরা, ঘুমোও! ছেলে ঘুমুল, পাড়া জুড়লো! রাতটি নামুক, অমনি জাগিয়ে দেব। হি-হি-হি! আর তোকে, লোহার সঙ, তোকে প্রথমটা ভালোরকম ভয় পাওয়াব আগে, তারপর ইস্ক্রুপ খুলে টুকরো টুকরো করব। আর তোকে হতভাগা পোটো, তোকে নিয়ে যাব আমার জাহাজে। আয় ঘুম, যায় ঘুম...'

'কোঁকর-কোঁ,' রেগে ডেকে উঠল মোরগ।

'চুপ, নচ্ছার মুরগী, জাগিয়ে দিবি যে!'

'কোঁকর-কোঁ, কোঁকর-কোঁ!'

'নিকুচি করেছে তোর মুরগী,' হিসিয়ে উঠল সিংধেল, 'দাঁড়া দেখাচ্ছি! আয় তো এদিকে, আয়-না!'

আঙুল নেড়ে ডাকলে সে। কিন্তু গরবী মোরগ কাছে যাবার নামও করলে না। দস্যু তখন ভাব করলে যে মাটিতে কী সব দানা ছড়াচ্ছে।

'দানা খা, দানা খা!'

'কোঁ-কোঁ?' জিজ্ঞেস করলে মোরগ।

'আয় রে মোরগ, দানা খাবি,' ভালো মানুষের মতো মুখ করে সোহাগ দেখিয়ে ডাকতে লাগল সে।

গরবী মোরগ কাছে এসে বললে:

'কোঁ-কোঁ!'

অমনি সে শেয়ালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। ইতি হল অ্যালার্ম ঘড়ির।

শুকনো পাতা জড়ো করলে ডাকাত, ডাল ভাঙলে, ধুনি জ্বালালে, মোরগের পালক ছাড়িয়ে সেঁকতে লাগল।

ধুনির ধোঁয়া কারো চোখে পড়ল না। লোকেরা সবাই তাকিয়ে ছিল অন্যদিকে।

ড্রাম বাজছিল শহরে, রুপোলী ব্যান্ড বাজছিল। রাস্তায় নেমেছে ছেলেমেয়েদের বাহিনী। তাদের সঙ্গেই পাশে পাশে চলেছে একটা সাজানো ট্রাক, তাতে লেখা:

'লোহা-লক্কড়'

শুরু হল মস্তো এক অভিযান।

ঘরে ঘরে জানলা খুলে গেল। ঝুল বারান্দা থেকে বুড়িরা ডাকাডাকি শুরু করলে: 'আমার ঘরে এসো গো ছেলেরা! কেটলিটা আমার পুরনো হয়ে গেছে, মেরামতের বাইরে।'

'ভারি উনি কেটলি দেখাচ্ছেন,' চ্যাঁচালে আরেকজন বুড়ি, 'আমার হল গে সামোভার। ধরো গো ছেলেরা, আমি দড়ি বেঁধে নামিয়ে দিচ্ছি।'

'আমাদের কাছে এসো! আমাদের কাছে!' শোনা গেল চতুর্দিকে।

নিজেরাই লোকেরা নানা রকমের অদরকারী মালপত্র এনে দিতে লাগল। ফুটো প্যান, ভাঙা কেটলি, সাইকেলের পুরনো চাকা এবং আরো হরেক রকম জিনিস ছেলেরা বোঝাই করতে লাগল ট্রাকে।

কাঠি পড়ল ড্রামে, বাজনা উঠল ব্যাণ্ডে, পেন্সিল আর সর্বকর্মা কিন্তু কিছুই শুনছিল না। অঘোরে ঘুমোচ্ছিল তারা।

ডাকাত ওদিকে মোরগের হাড় চিবাল, ঘোঁৎঘোঁৎ করলে খানা-পাওয়া খেঁকী কুকুরের মতো।

শহরের মিনারে ঘড়িতে বাজল বারোটা। মস্তো এক অর্কেস্ট্রায় শুরু হল উচ্ছল বাজনা। বাসন্তী সরণি দিয়ে ছিমছাম সারি বেঁধে চলল কিশোর টেকনিশিয়ান, কিশোর ওস্তাদদের দল।

তাদের সঙ্গে যাচ্ছিল ছোট্ট প্রুতিক, ছবির খোকন।

যত এরোপ্লেন, রকেট, স্পুৎনিক, জাহাজ, মোটরগাড়ির মডেল নিয়ে যাচ্ছিল তারা, হরেক রকমের হাজার হাজার মডেল। বোঁ-বোঁ করছে এরোপ্লেনের প্রপেলার, সংকেত দিয়ে মাথার ওপর ঘুরছে স্পুৎনিক; হাত ছাড়িয়ে নীল আকাশে উড়ে যেতে চাইছে রকেট।

ঝুল বারান্দা থেকে 'হুররে' দিচ্ছিল লোকজন, ফুল ছুড়ছিল। সবাই দেখলে ছোট্ট প্রুতিক একটা পোস্টার বইছে:

চলো গলিঘুঁজি
দাও চক্কর,
জড়ো করে আনো
লোহা-লক্কর।

সর্বকর্মা আর পেনসিল কিন্তু প্রুতিককে দেখতে পেলে না।

'আয় ঘুম, যায় ঘুম...' ফিসফিস করছিল গুপ্তচর।

ওদিকে শহরের ওপর উড়ছিল রাজ্যের বেলুন আর পায়রার ঝাঁক। বিজয় চকে উঁচু মঞ্চের ওপর তোলা হল প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের — তিনটি হাসিখুশি মেয়ে, আর তিনটি হাসিখুশি ছেলে।

উপহার পেলে তারা বাইসাইকেল আর ক্যামেরা।

'হুররে! হুররে!' চেঁচিয়ে উঠল সবাই।

ঘুম ভেঙে গেল সর্বকর্মার। এক চোখ মেলে গুপ্তচরকে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ বন্ধ করলে।

'মাগো, কী ভয়ঙ্কর স্বপ্ন!'

'স্বপ্ন নয়,' ঘুম ভেঙে বললে পেনসিল, 'বন্দী হয়ে পড়েছি আমরা।'

'আস্তে, গোলমাল করবে না!' পিস্তল উঁচিয়ে ধরল দস্যু, 'চুপচাপ বসে থাকো। অন্ধকার নামলে আমার সঙ্গে যাবে।'

'আমাদের প্রুতিক গেল কোথায়?' দীর্ঘশ্বাস ফেললে পেনসিল, 'আমাদের ছাড়া যে ও মারা পড়বে, ভারি যে ছোটো...'

অধ্যায় উনচল্লিশ

জলদস্যুর উদয়

কেন জানি, বরাবরই উৎসবগুলো শেষ হয়ে যায় ভারি চট করে।

সন্ধে নামল। রাস্তায় গান জুড়লে লোকজন, নাচলে, কিনলে আইসক্রীম, লজেন্স, চকোলেট।

সবচেয়ে চুপচাপ ফাঁকা গলিগুলো দিয়ে যাচ্ছিল দুই মনমরা বন্ধু আর এক দিলখোস দস্যু।

'না, আমি তোর ইস্ক্রুপ খুলে নেব না,' বিদ্রূপ করলে ডাকু, 'বরং তোকে নদীতেই ফেলে দেব। তুই যে লোহা, গায়ে জল লাগাতে চাস না...'

লোহার মানুষ, গর্বিত সর্বকর্মা উত্তর দিলে না। যাদুকর পটুয়া পেনসিলকে কী করে বাঁচানো যায় তার উপায় ভাবছিল সে। কিন্তু পিস্তল, প্রকাণ্ড ওই ভয়ঙ্কর পিস্তলটা! দুনিয়ার সবচেয়ে নির্ভীক, সবচেয়ে বলবান লোকও ভয় করে পিস্তলকে। ছোট্ট সর্বকর্মাও ভয় পাচ্ছিল।

'পা চালা! পা চালা!' হুকুম দিলে সিঁধেল, 'জাহাজটা এবার নজরে আসছে। খাশা জাহাজ!'

প্রশান্ত উপকূলে এল তারা, নদীর তীরে তিন মাস্তুলের 'প্রীতিক' জাহাজটা ছিল যেখানে। তাদের দিকে ছুটে এল, কে বলো তো?

ক্যাপটেন টগবগ!

'আমাদের দফা শেষ!' ফিসফিস করলে পেনসিল, 'আর আশা নেই। বিদায় সর্বকর্মা!

কিন্তু দস্যু সিঁধেল অমন কেঁপে উঠল কেন?

'বিশ্বাসঘাতক! জঘন্য বিশ্বাসঘাতক!' ছুটতে ছুটতে গর্জন করলে ক্যাপটেন টগবগ, 'বেইমান!'

'কাছে আসবেন না বলছি। গুলি করব কিন্তু!' জলদস্যুর দিকে পিস্তল বাগিয়ে চিঁচিঁ করে বললে সিঁধেল। কিন্তু হাত ওর এমন কাঁপছিল যেন পিস্তল ধরে নেই, চুনকাম করার বুরুশ দিয়ে দেয়ালে চুন লেপছে। একবার এদিক, একবার ওদিক।

ঝড়ের মতো ঝাঁপিয়ে এল জলদস্যু। কেঁউ-কেঁউ করে উঠল সিঁধেল, পরস্পর জড়াজড়ি করে রাস্তায় গড়াতে লাগল দুই দস্যু।

'ওরে মেরে ফেললে রে! বাঁচাও!' কঁকিয়ে উঠল সিঁধেল, 'ওরে মা-রে, ওরে বাবারে!'

'জলার ভূত কোথাকার!' দোস্তের নাকে ঘুষি চালিয়ে গর্জে উঠল জলদস্যু।

'আর কখনো করব না! ঠাট্টা করছিলাম!' হাউ-মাউ করে উঠল সিঁধেল, 'ঠাট্টা!'

'এই নে তোর ঠাট্টার প্রতিফল, কেঁচো কোথাকার!' অব্যর্থ লক্ষ্যে দোস্তের কানে ঘুষি মেরে বললে জলদস্যু।

'আমি যে পেন্সিলকে ধরেছি। আমিই তাকে পাকড়েছি। লোক আমি খুব ভালো। সবচেয়ে খাঁটি লোক আমি।'

দোস্তের চাঁদি থেকে এক মুঠো চুল ছিঁড়ে নিতে যাচ্ছিল জলদস্যু, এ কথা শুনে সে মারপিট থামালে।

'কথাটা আগে বললেই পারতিস! নে, দেখা কোথায় পেন্সিল!'

'দেখা!' ভেঙচি কাটলে গুপ্তচর, 'দেখাব কোত্থেকে! পালিয়ে গেল যে! উহু, বড্ডো লাগছে! আহ্!'

'ধরতে হবে! হুকুম দিলে জলদস্যু, 'এসো আমার পেছু পেছু! কেলে-ছোপ. কুত্তাজান বেটা, ছোট আগে!'

চোখের জল মুছে সিঁধেল চলল তাদের পেছন পেছন।

অধ্যায় চল্লিশ

অতি শোচনীয়

পেন্সিল আর সর্বকর্মা লুকিয়েছিল রামধনু সেতুর উঁচু খিলানের তলে। কিন্তু কেলে-ছোপ ছুটল ঠিক তাদের দিকে।

'বেড়াল! চট করে বেড়াল আঁক!' ফিসফিস করলে সর্বকর্মা।

কাঁপা কাঁপা আঙুলে এক হিংস্র বেড়াল আঁকলে পেন্সিল।

'ম্যাও!' কেলে-ছোপকে দেখে পিঠ বাঁকিয়ে বিচ্ছিরি ডাক ছাড়লে বেড়ালটা।

এ আস্পর্ধা সইতে না পেরে কেলে-ছোপ কর্ণভেদী গর্জন করে ছুটে গেল তার দিকে। বেড়ালটা ঢুকে পড়ল এক গলিতে। কুকুর আর দস্যু দুজনও বাঁক নিল সেখানে।

প্রশান্ত উপকূল দিয়ে ছুটতে লাগল দুই বন্ধু।

'ঘেউ-ঘেউ!' শোনা গেল অনেক পেছনে।

'শীগগির, পেন্সিল, শীগগির!'

ডাকুরা কিন্তু বোকা কুকুরটাকে গাল দিতে দিতে ফিরে আসছিল তীরের দিকে।

বাড়িগুলোর দরজায় সজোরে করাঘাত করলে পলাতকরা, ডাকাডাকি করলে সাহায্যের জন্যে, কিন্তু কেউ দরজা খুললে না। সবাই চলে গিয়েছিল বাসন্তী সরণিতে।

একটা গলিতে পাশ দিয়েই গেল একটা গাড়ি। সাধারণ গাড়ি নয়, জল দেবার গাড়ি। রাস্তা, ফুটপাথ আর গাছপালায় ঠাণ্ডা পরিষ্কার জল ঢেলে যাচ্ছিল সেটা।

হাত নেড়ে দুই বন্ধু ছুটে গেল গাড়িটার কাছে।

'কাকু দাঁড়ান, নিয়ে চলুন আমাদের! আমাদের পেছনে ডাকাত লেগেছে!'

ড্রাইভার কিন্তু শুনলে না। ভাবলে, 'আচ্ছা চীজ এই ছোঁড়াগুলো। রাতেও রেহাই দেয় না। গাড়িতে উঠতে চায়!' এই ভেবে সে চলে গেল, যাবার সময় আপাদমস্তক ভিজিয়ে দিলে পেন্সিল আর সর্বকর্মাকে।

'ঘেউ! ঘেউ! ঘেউ!'

প্রায় এসে পড়ছে ডাকাতরা।

'দাঁড়া,' সর্বকর্মাকে বললে পেন্সিল, 'তোয়ালে এঁকে দিই। তোর ভালো করে গা মোছা দরকার, নইলে জং ধরে যাবি।'

'তার সময় নেই। জলদি! জলদি ছোট!'

কিন্তু হঠাৎ পেন্সিলের খেয়াল হল সর্বকর্মা পেছিয়ে পড়ছে।

'ইস, কী চেহারা হয়েছে তোর! নিশ্চয় অসুখ করেছে?'

'জং ধরে যাচ্ছি আমি,' সখেদে ভাবলে লোহার মানুষটি, 'ভালো দৌড়তে পারছি না।' কিন্তু বললে অন্য কথা:

'দৌড়চ্ছি না আমি ইচ্ছে করেই। কী করতে হবে বুঝেছি। আমি ওদের ঠেকাব।'

'একেবারে তুই অসুস্থ!'

'না, না, অসুস্থ নই। তুই চটপট পালা। ওরা তো আর আমায় নয়, ধরতে চাইছে তোকে। তোকেই ডাকাতদের দরকার। শীগগির পালা। আমি লড়ে যাব। দেখাব ওদের! কার্লাসটে তুলে ছাড়ব। আমার ভয় নেই, গায়ে অনেক জোর আছে আমার! এই দ্যাখ, দেখেছিস!'

মুষ্টিযোদ্ধার মতো ঘুষি পাকিয়ে সে লাফাতে লাগল একই জায়গায়। এমন লড়াকুর মতো হাত চালাতে লাগল সে যে পেন্সিল তার কথায় বিশ্বাস করলে।

'বেশ, আমি ছুটলাম। গিয়ে পুলিস ডেকে আনব।'

বন্ধুকে চুমু খেয়ে ছুটে চলে গেল সে।

'আরে এই যে! ধরেছি ব্যাটাকে।' সর্বকর্মাকে দেখে হাঁক দিলে জলদস্যু. 'পেন্সিলটি কোথায়?'

'পেন্সিলকে আর পেতে হচ্ছে না।'

'ঘুষি মারব তোকে,' ক্ষেপে উঠল জলদস্যু।

'বটে, দেড়েল ঝাঁটা!' বললে সর্বকর্মা, 'নে আয়, তোর দাড়ি উপড়ে নেব।'

'কী ব-ল-লি?' রাগে সবুজ হয়ে উঠল ক্যাপটেন টগবগ।

'দে মার,' উস্কানি দিলে সিংধেল, 'এই সর্বকর্মা, ভালো চাস তো পেনসিলকে ফিরিয়ে দে, নইলে গুলি করব।'

লোহার ছোট্ট মানুষটিকে কিন্তু কাঁপানো গেল না। ঝনঝন করে উঠল সে, হেসে উঠল।

গুপ্তচর সিংধেল তখন তার ভয়ঙ্কর পিস্তলটা উঁচিয়ে গুলি চালিয়ে দিলে।

ঠক করে সর্বকর্মার বুকে ঠেকে পিছলে গেল গুলিটা।

'গুলি আমার গায়ে বেঁধে না! হুররে!!!' স্প্রীঙের ওপর লাফিয়ে উঠল সর্বকর্মা, লোহার মাথা দিয়ে গুঁতো মারলে দস্যু সিংধেলকে।

রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল সিংধেল।

'ফতে!' জলদস্যুকে ঘা মেরে চেঁচিয়ে উঠল সর্বকর্মা।

যন্ত্রণায় গাঁক-গাঁক করে উঠল ক্যাপটেন টগবগ। কিন্তু আহত সর্বকর্মা, জং ধরা সর্বকর্মাও খাড়া থাকতে পারল না। পড়ে গেল সে। কেলে-ছোপ এসে কামড়ে ধরলে তার পা।

ঘুষি মারতে মারতে দেড়েল দস্যু ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

'মার সর্বকর্মাকে, মার!' মাটিতে পড়ে থেকেই উপদেশ দিলে সিংধেল, 'জোর ওর ফুরিয়ে আসছে! মার!'

সর্বকর্মা লাফিয়ে উঠেই — গদাম! দাঁত ঠকঠকিয়ে দেড়েল ধপাস্ করে পড়ল গুপ্তচরের ওপর।

'উহু, গেছি রে, বাঁচাও!' মিনতি করে উঠল দমবন্ধ সিংধেল।

'ফতে!' সর্বকর্মা বললে বটে, তবে গলার স্বর প্রায় শোনাই গেল না। হাত-পা সে নাড়াতে পারছিল অতি কষ্টে।

ধূর্ত গুপ্তচর সিংধেল এই সময় অলক্ষ্যে পকেট থেকে বার করলে খেলনার দোকানে মেরে দেওয়া চুম্বকটি, বাড়িয়ে ধরলে সেটি সর্বকর্মার দিকে। লোহার মানুষটিও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল, আটকে গেল চুম্বকটার সঙ্গে।

'হি-হি!' গলা ঘড়ঘড়িয়ে বললে সিংধেল, 'ফতে-এ-এ!'

'ফ-তে-এ!' গাঁঙিয়ে উঠল ক্যাপটেন টগবগ, 'ওকে বেঁধে ফেলা দরকার!'

বেচারি সর্বকর্মাকে বেঁধে ফেললে ডাকাতরা।

'এইবার তোর ইস্ক্রুপ খুলে টুকরো টুকরো করব, নচ্ছার লোহার চ্যাঙড়া!'

স্ক্রু-ড্রাইভার বার করলে সিংধেল, সেই যেটিকে মেরে দিয়েছিল মিস্ত্রির কাছ থেকে। প্রথমে তার এক দিকটা ধরলে সে, তারপর অন্য দিকটা, ওলটালে, শংকেও দেখলে কী যেন। কিন্তু এ যন্ত্র কী করে ব্যবহার করতে হয়, ডাকাতরা সেটা জানত না। আগে কখনো স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে ওদের কাজ করতে হয় নি। তাই কোনো লাভ হল না।

স্ক্রু-ড্রাইভার ছুড়ে ফেললে সিংধেল। ঠং করে কোথায় গিয়ে সেটা পড়ল।

'ওইখানে!' বললে দেড়েল ডাকাত।

'ওইখানে মানে?' জিজ্ঞেস করলে সিংধেল।

'ওই যে ওইখানে একটা গর্ত, গর্তের ওপর লোহার কাছে।'

সত্যিই রাস্তায় ছিল ছোটো একটা ফুটো, তার ওপর লোহার ঝাঁঝরি। প্রত্যেক শহরেই রাস্তায় এই ধরনের ঝাঁঝরি-ঢাকা ফুটো থাকে। বৃষ্টির জল গলে যায় তা দিয়ে তলাকার ড্রেনে।

চকচক করে উঠল গুপ্তচরের চোখ।

'ঠিক, ওখানেই কবর দেব সর্বকর্মাকে। জল বইছে তল দিয়ে, হি-হি — জল ছুটে যাচ্ছে নদীতে। ডুবে মরবে বেটা, কখনো আর আমাদের মারতে আসবে না।'

'জল কোথায় ছুটে যাচ্ছে জানি না,' হেঁড়ে গলায় বললে ক্যাপটেন টগবগ। 'তবে ঐ দ্যাখ, পেনসিল পোটো নিজেই ছুটে আসছে আমার কাছে।'

অন্ধকার নির্জন গলিটা দিয়ে প্রাণপণে ছুটে আসছিল পেনসিল। গুলির শব্দ তার কানে গিয়েছিল। ছুটে এল সে বন্ধুর সাহায্যে।

'ছেড়ে দিন সর্বকর্মাকে! দয়া করুন ওকে!'

'ওটি হচ্ছে না।' নিথর সর্বকর্মাকে ড্রেনের জালি-ঢাকনাটার দিকে টানতে লাগল সিংধেল।

মরিয়া হয়ে পেনসিল ঝাঁপিয়ে পড়ল সশস্ত্র দস্যুদের ওপর। কাঁদলে সে, চেঁচালে, হাত-পা ছুড়লে। কিন্তু ডাকাতরা বেঁধে ফেললে ওকে, বস্তায় পুরলে, তারপর সর্বকর্মাকে ফেলে দিলে ড্রেনের ভেতর।

শোনা যাচ্ছিল নিচে জলের আওয়াজ...

মারা পড়ল লোহার ছোট্ট মানুষটি। প্রাণ গেল সর্বকর্মার। পেনসিলকে ধরে নিয়ে গেল ডাকাতেরা। আর বলার ক্ষমতা আমার নেই। আর কোনো কথাই বলব না, শুধু একটি কথা ছাড়া —

শেষ।

অধ্যায় একচল্লিশ

ভোনিয়া কার্শাকিনের লোহা জোগাড়

কিছুই আর বলব না ভেবেছিলাম, কিন্তু গলিতে হঠাৎ দেখা দিলে ভোনিয়া কার্শাকিন। মন তার খারাপ। প্যারেডে যাবার নিমন্ত্রণ পায় নি সে। ভাঙা লোহা-লক্কড় সেও জোগাড় করেছিল। প্রথমে সে রাস্তা থেকে নিয়ে আসে আবর্জনা ফেলার পাত্র। কিন্তু ওকে বলা হল:

'এটা কোনো ভাঙা লোহা নয়। যে সব ছেলেমেয়ে রাস্তায় কাগজে মোড়া বা কার্ডবোর্ডের কাপে ভরা আইসক্রীম কেনে, এটা তাদের জন্যে খুবই দরকার...'

ভোনিয়া কিন্তু সবটা শুনলেও না। রাগে সে থুতু ফেললে পাত্রটায়, বসিয়ে দিলে সেটা চকের একেবারে মাঝখানটায়। তারপর বুঝতেই পারছ, অভিমান করে বাড়ি চলে গেল টেলিভিশন দেখতে।

টেলিভিশন খুলতেই দেখা গেল সেই উৎসবটারই সম্প্রচার, ভোনিয়া যার নিমন্ত্রণ পায় নি।

অনেকক্ষণ ধরে ভোনিয়া দেখলে কী ভাবে ফুর্তি করছে সব ছেলেপিলে। তারপর নিজের মনেই বললে: 'ভারি আমার আহা-মরি ব্যাপার, লোহা জোগাড় করো! অমন বাজে কাজে আমি নেই।'

আর টেলিভিশনের স্ক্রীনে দেখা গেল ফুর্তি করছে ছেলেপিলেরা, নাচছে সেই চকটাতেই যেখানে ডাস্টবিনটা রেখেছিল ভোনিয়া। ছেলেরাও আইসক্রীম খেয়ে কাগজের কাপগুলো ফেলছিল তাতে।

টেলিভিশন বন্ধ করে দিলে ভোনিয়া। ভারি একঘেয়ে লাগছিল তার। বেরিয়ে এল রাস্তায়। আর প্রশান্ত উপকূল দিয়ে যখন সে যাচ্ছিল, মনে হল যেন বস্তা ঘাড়ে দুজন লোক ঘুরে গেল শেষ বাড়িটার মোড়ে।

শিস দিলে ভোনিয়া, তাকিয়ে দেখলে রাস্তাটা। আর কারো কিছু না হারালে তকতকে ধোয়া রাস্তায় ড্রেনের ঝাঁঝরি ছাড়া আর কীই বা দেখা যাবে?

ঝাঁঝরিটার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল ভোনিয়া।

আরে, কী যেন ঝকমক করছে।

ঝাঁঝরির ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে চুম্বক সমেত সর্বকর্মাকে টেনে তুলল সে।

এ যে অসম্ভব! সত্যিই সর্বকর্মা নাকি?

হ্যাঁ, সর্বকর্মাই বটে। লোহার মানুষটা নিচে পড়ে যায় নি। চুম্বক আটকে

গিয়েছিল লোহার ঝাঁঝরিতে, আর সর্বকর্মা ঝুলছিল চুম্বকের গায়ে। নিচে কলকলিয়ে ছুটছিল জল। তবে সর্বকর্মা তখন আর কিছু দেখছিলও না, শুনছিলও না।

'লোহা! ভাঙা-লক্কড়!' খুশি হয়ে উঠল ভোনিয়া কাশাকিন, 'নিজেই আমি খুঁজে পেয়েছি। এর জন্যে আমায় সাইকেল দেবে। তাছাড়া ক্যামেরা। সবাই হিংসেয় জ্বলে মরবে। যাই বিজয় চকে।'

লোহার মানুষটিকে দোলাতে দোলাতে ছুটল ভোনিয়া।

বিজয় চকে ভোনিয়া সগর্বে ঢুকল কিশোর টেকনিশিয়ানদের দপ্তরে, বাড়িয়ে দিলে তার আবিষ্কার।

'বাহবা!' তারিফ করা হল ভোনিয়াকে, 'কী একটা জং ধরা যন্ত্রের পার্টস তুই নিয়ে এসেছিস ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে লোহাটা খাটি, শক্ত। ওটাকে ফের গালাই করার জন্যে কারখানায় পাঠিয়ে দেব। এ থেকে হয়তো খেলনা বানাবে, হয়তো বা সত্যিকারের মোটরগাড়ি। আইসক্রীম খাবি?'

'কিন্তু ক্যামেরা কই?'

'ক্যামেরা সব ফুরিয়ে গেছে।'

'যাক গে, তাড়াতাড়ি তাহলে সাইকেলটাই দিয়ে দিন, ক্যামেরার জন্যে কাল আসব।'

'সাইকেল সব দিয়ে দিয়েছি আমাদের বিজয়ীদের। তুই এনেছিস এক কিলোগ্রাম নব্বুই গ্রাম ওজনের ভাঙা লোহা। আর যে প্রথম হয়েছে, সে জোগাড় করেছে একুশ কিলোগ্রাম...'

খালি হাতেই বেরিয়ে এল ভোনিয়া, ঘুরে বেড়াতে লাগল রাস্তায়, হঠাৎ চোখে পড়ল আবর্জনা ফেলার পাত্রটা। সেইটে, যেটাকে সে ভাঙা লোহা বলে চালাতে চেয়েছিল।

'ওহো! পেয়েছি!'

গুঁতো মারলে সে পাত্রটায়, ঝেড়ে এক লাথি কষলে।

ঝনঝনিয়ে গড়িয়ে গেল পাত্রটা, ছড়িয়ে পড়ল কাগজের কাপগুলো। তবে কেউ সেটা লক্ষ করলে না, সবাই ফুর্তি করছে।

পাত্রটার পেছনে ছুটে গেল ভোনিয়া, লাথি মারতে মারতে তাকে নিয়ে গেল প্রশান্ত উপকূলের দিকে।

'সব তোর দোষেই!' চটে বললে ভোনিয়া, 'আমি তোকে পেরেক মেরে ফুটো করে দেব, তারপর দিয়ে দেব ভাঙা লোহা হিশেবে। কেউ তখন আর বলবে না তুই

দরকারী জিনিস!.. উ'হ্, যাক গে ফুটো আর করব না। সাইকেল তো আর মিলবে না। তোকে ফেলে দেব নদীতে। হাসির ব্যাপার হবে।'

শান্ত গলি দিয়ে ঝনঝনিয়ে ভোনিয়া কার্শাকিন এগ্তে লাগল প্রশান্ত উপকূলের নিশ্তি নদীর দিকে।

অধ্যায় বেয়াল্লিশ

ভোনিয়ার বোম্বেটোগিরি

জাহাজে ডাকাতরা বস্তা থেকে পেনসিলকে বার করে তার বাঁধন খ্লে দিলে।

'ভাইটি আমার, লক্ষ্মীটি আমার,' পেনসিলকে তোয়াজ করতে লাগল সিংধেল, 'মিনতি করে তোকে বলছি, প্রথমে আমাদের জন্যে আইসক্রীম এংকে দে।'

'এক পিপে মদ!' দাবি জানাল জলদস্য। বইয়ে যাদের কথা লেখা হয়, সত্যিকারের তেমন সমস্ত জলদস্যর মতোই সেও মদ খেতে ভালোবাসে। 'মদ! গলা আমার শ্কিয়ে উঠেছে!'

'কিছ্ই আমি আঁকব না,' ম্দ্ গলায় হলেও দ্ঢ়ভাবেই বললে পেনসিল, 'সর্বকর্মাকে খ্ন করেছ তোমরা। মরে গেলেও আমি আঁকব না।'

'আঁকবি না?' চোখ পাকাল জলদস্য, 'মার খাবি তাহলে। বলছি আঁক! চটপট!'

ক্ষ্দে পটুয়া কোনো জবাব দিলে না। সখেদে সে জাহাজের জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইল কালচে জলের দিকে — এই জলকেই ভয় পেত নির্ভীক সর্বকর্মা।

কত সাধ্য-সাধনা করলে ডাকাতরা, কত শাসালে, একটি কথাও বললে না পেনসিল।

'বন্ধ করে রাখ ওকে, বেংধে রাখ! বসে থাকুক উপোস দিয়ে।'

'আর আমাদের কী হবে?'

'ভাবনা কী!' বললে দেড়েল ডাকাত, 'ছ'গণ্ডা পায়রা মারব। খাওয়া যাবে পায়রার রোস্ট। কাল আমার জাহাজ ছেড়ে যাবে এই যাচ্ছেতাই শহরটা থেকে। চলে যাবে খোলা মহাসাগরে, ব্যাটা পোটোকে আঁকতে বসাব। এ জাহাজের ক্যাপটেন আমি। কাল হ্কুম দেব, পাল তোলো!'

'কিন্তু তুলবে কে?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে সিংধেল।

'কে আবার, মাল্লা-খালাসিরা!'

'ম-মাল্লা! কিসের মাল্লা? আমাদের এখানে মাল্লা কোথায়?'

'আমি যদি ক্যাপটেন হই,' বললে জলদস্যু, 'তাহলে বোঝাই যাচ্ছে মাল্লা হচ্ছিস তুই!'

'আমি মাল্লা নই। পাল তুলতে আমি পারিই না। কমজোরী লোক আমি,' ঘ্যানঘ্যান করলে গুপ্তচর।

'যত বাজে কথা! কিস্যু না! আমি তোকে শিখিয়ে দেব। অবিশ্যি তুই কমজোরী লোক, তা ঠিক। আমার জাহাজে সত্যিকারের টিম নেই। অন্তত আরো একজন ডাকাত পেলেও হত,' বললে ক্যাপটেন টগবগ।

তীরে শোনা গেল দুর্বোধ্য একটা ঝনঝন। ডেকে ছুটে এল ডাকাতরা। ডাস্টবিনটাকে ভাসমান দোকানের জেটির দিকে লাথিয়ে আনছিল ভেনিয়া। ঝমঝম ঝনঝন করছিল ডাস্টবিন, লাফাচ্ছিল, পালিয়ে যেতে চাইছিল ভেনিয়ার কাছ থেকে, ফুটবল যেমন পালায় খেলোয়ারকে ফেলে। ভেনিয়া কিন্তু ছুটে গিয়ে লাথি ঝাড়ছিল তার পেটে।

'হুররে!' চেঁচাচ্ছিল ভেনিয়া, 'আরো এক শট! গোল!'

বেশ ফুর্তিই লাগছিল ভেনিয়ার। এত হৈচৈ, ঝনঝন, অথচ কেউ ধমকাচ্ছে না। নেই কেউ: সবাই গেছে উৎসবে।

'কেরে দস্যিটা!'

খুলে গেল তিন তলার জানলা, দেখা গেল ঘুম-পাওয়া এক বুড়িকে।

'কী লাগিয়েছিস এ সব! দেব কষে কান মলে, হতচ্ছাড়া দস্যি।'

'দস্যু!' খুশি হয়ে উঠল সিঁধেল, 'শুনলেন ক্যাপটেন? লোকটা দস্যু। ঠিক যেটি চাইছিলাম। ও হবে খালাসি। আমিও হুকুম দিতে চাই বইকি।'

দাড়ি ঝেড়ে বুক টান করে দাঁড়াল ক্যাপটেন টগবগ।

'দস্যু মশায়! আমার জাহাজে একবারটি আসবেন কি? আমি হলাম ক্যাপটেন টগবগ। আসুন এখানে।'

'কে? আমি যাব জাহাজে?' নিজের কানকেও ভেনিয়ার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

'আপনি বইকি! ডেকে উঠে আসুন।'

সম্মোহিতের মতো ভেনিয়া এগিয়ে গেল প্যারাপেটের দিকে। সামনে তার দাঁড়িয়ে আছে আশ্চর্য এক পাল-তোলা জাহাজ, নদীর ঢেউয়ে দুলছে।

'স্যালিউট!' হুকুম দিলে ক্যাপটেন টগবগ, 'তোপ স্যালিউট!'

ঘটনাটা হল একেবারে সিনেমার মতো। গর্জে উঠল কামান। বারুদের শাদা ধোঁয়া উঠল মাস্তুলের ওপর। ঝট করে বন্ধ হয়ে গেল তিন তলার জানলাটা।

'হুররে!' চেঁচিয়ে উঠল ডাকাত সিঁধেল।

'বাঃ!' হেসে উঠল ভোনিয়া কার্শাকিন।

জাহাজ থেকে তীরে নামানো হল সরু কাঠের সিঁড়ি। ঢেউয়ে জাহাজটা সরে এসেছিল একেবারে তীরের কাছে। ডেকে লাফিয়ে নামল ভোনিয়া। ক্যাপটেন প্রথমে পুরনো দোস্তের মতো কোলাকুলি করলে ভোনিয়ার সঙ্গে, সুড়সুড়ি দিলে তার পাটকিলে দাড়ি দিয়ে। তারপর গুপ্তচর এসে পিঠ চাপড়ে দিলে তার।

'সাবাস দোস্ত!' চোখ মটকালে জলদস্যু, 'কেমন চলছে। লুটলে কত?'

'আমি?' অবাক হয়ে গেল ভোনিয়া, 'আমি তো কিছু লুট করি নি...'

'শোনো কথা! হা-হা-হা! ও কথা আমরা বিশ্বাস করব ভেবেছিস। তুই যে ডাকাত! নে বল তোর ডাকাতে ওরফে নামটা কী?'

'কিসের ওরফে!'

'আরে ওই যে... কী বলে তোকে ডাকে?'

'ভোনিয়া বলে।'

'আর আমি হলাম ক্যাপটেন টগবগ।'

'আপনি নিশ্চয় খুব নামকরা ক্যাপটেন,' বললে ভোনিয়া, 'কোথায় যেন আপনাকে দেখেছি।'

'নামকরা তো বটেই। যাবি আমার সঙ্গে সমুদ্র যাত্রায়? বাঁয়ে ঘোরাও, ডাইনে ঘোরাও?'

'যাব,' লাফিয়ে উঠল ভোনিয়া, 'বাঁয়ে হাল! ডাইনে হাল!'

'খাশা! তোকে আমার দঙ্গলে নেব, মানে দলে। একসঙ্গে ডাকাতি করে বেড়াব। চালাও গুলি, লাগাও আগুন, লুট করো।'

'আমি লুট করতে পারি না,' বললে ভোনিয়া।

'হা-হা-হা! রগুড়ে বটে!' হেসে উঠল সিঁধেল, 'সত্যিই কি তুই কখনো পরের জাহাজ লুটিস নি, ডোবাস নি?'

'হা-হা-হা! আমরা তোকে শিখিয়ে দেব,' বললে জলদস্যু, 'এবার আমাদের সত্যিকারের দল হয়েছে। তুই হলি আমাদের কুড়ে-সাঙাত... থুড়ি... ধেড়ে-ডাকাত!'

'আমি ডাকাত নই,' কিছুই বুঝতে না পেরে তো-তো করলে ভোনিয়া, 'লুটপাট আমি করব না।'

ডাকাতে-ডাকাতে চেহারা, বাঁকা ভোজালি, পিস্তল — এ সব কেবল এতক্ষণেই চোখে পড়ল তার। ভয় করতে লাগল।

'তাহলে তুই করবি-টা কী?' মুখ আঁধার করলে জলদস্যু।

'জাহাজ চালাব। সমুদ্রে, ঢেউ ভেঙে যাব...'

'জাহাজ চালাবি? শুনছিস সিঁধেল, উনি নাকি জাহাজ চালাবেন! ডাইনে হাল, বাঁয়ে হাল! আরো তোর কী সখ শুনি?' বিদ্বেষের আনন্দে জিজ্ঞেস করলে ক্যাপটেন।

'বাড়ি যাব।' ফুঁপিয়ে উঠল ভেনিয়া কাশকিন।

'বিশ্বাসঘাতকতা!' ধমকে উঠল জলদস্যু, 'বেইমানি! পালাবার মতলব?! ঝুলিয়ে দাও ওকে মাস্তুলে, পাজি কোথাকার!'

দড়ি নিয়ে এল ক্যাপটেন, কিন্তু সিঁধেল ওর কানে ফিসফিস করলে:

'ফাঁসি দেবেন না ক্যাপটেন, তাহলে আমাদের কোনো খালাসি থাকবে না।'

আতঙ্কে ডুকরে কেঁদে উঠল ভেনিয়া:

'মাকে বলে দেব!'

'হা-হা-হা!' অট্ট হাসলে ডাকাতরা, 'হো-হো-হো!'

'মাগো! মা!'

ভেবেছিল লাফিয়ে পড়বে তীরে। কিন্তু ডাকাতরা পাকড়ে ধরল ওকে, বেঁধে ছেঁদে ঢুকিয়ে দিলে যেখানে পেনসিল বসেছিল, বন্ধ করে দিলে তালা।

উপকূল দিয়ে তখন ইঞ্জিনের গর্জন তুলে ছুটে যাচ্ছিল একটা ট্রাক; তাতে লেখা:

'লোহা-লক্কড়'

ট্রাকটা যাচ্ছিল শহরের অন্য প্রান্তে, গালাই-কর চকে।

অধ্যায় তেতাল্লিশ

গালাই-কর আর সেদ্ধ পেরেক

ভাত সেদ্ধ করা দেখেছ কখনো? কিংবা আলু? চাল সেদ্ধ হতে পারে। সেটা তেমন কঠিন কিছু নয়। কিন্তু লোহার পেরেক সেদ্ধ করা যায় কি? এমন সেদ্ধ যাতে পেরেকগুলো গলে যাবে? এক্ষুনি জানা যাবে ব্যাপারটা।

শহরের শেষ প্রান্তে গালাই-কর চকে সারা রাত কাজ চলেছে এক মস্তো কারখানায়। প্রকাণ্ড এক পাথুরে চুল্লি আছে কারখানাটায়।

এমন গনগনে চোখ-ধাঁধানো আগ্নন জবলে সেখানে যে সোজাসন্জি তাকানো যায় না। লোহা সেদ্ধ হয়েছে এ সব চুল্লিতে। সে লোহা আগ্ননের মতো গরম, গন্ড়ের মতো তরল। গলে গেছে তা আখায় চাপানো আইসক্রীমের মতো।

আগন্নের কাছে এল গালাই-কর। লোকে তার এ নাম দিয়েছে কারণ যে কোনো শক্ত ইস্পাত সে গলাতে পারে। কালো কাঁচের ভেতর দিয়ে সে গলা লোহার দিকে চেয়ে বললে:

'সব ঠিক আছে।'

এই সময় গালাই-করের টেলিফোন বেজে উঠল।

'হ্যালো, আমি গালাই-কর,' বললে সে টেলিফোনের রিসিভারে।

'একবারটি গন্দামে আসন্ন,' টেলিফোনে বলা হল তাকে, 'দেখে যান কী ধরনের লোহা-লক্কড় পাঠিয়েছে ছেলেরা।'

'ঠিক আছে। শীগগির আমার শিফট শেষ হচ্ছে। তখন যাব।'

সকাল হয়ে যখন কারখানার রাতের শিফট শেষ হল, গালাই-কর তখন তার কাজের পোষাক খন্লে রেখে গেল গন্দামে।

'চমৎকার সব লোহা-লক্কড় পাঠিয়েছে তো ছেলেরা,' তারিফ করলে সে, 'সাবাস! কিন্তু এটা আবার কী মজার যন্ত্র?'

'কীসের যন্ত্র?' জিজ্ঞেস করলে গন্দাম-দার, 'ও, এইটে? আমি নিজেই ধরতে পারছি না। কী সব স্প্রীঙ, ইস্ক্রুপ, ভারি অদ্ভুত। কিন্তু যখন আমাদের এখানে পাঠিয়েছে, তখন নিশ্চয় ওই জং ধরা জিনিসটা কারো কাজে লাগছে না। ওটাকে গলিয়ে কোনো একটা দরকারী জিনিস বানানো দরকার। কিন্তু দাঁড়ান, দাঁড়ান। দেখতে যেন মানন্ষের মতো। তাই না?'

'সত্যিই তো। আমার মনে হয় এটা কোনো খেলনা। বিকল হয়ে গেছে। জিনিসটা আমায় দিন-না। আমার ছেলে তিমা এখন কিশোর টেকনিশিয়ান হয়েছে। খেলনা মেরামত করে।'

'বেশ, নিন। তবে ওটা মেরামত করতে হলে আপনার ছেলেকে অনেক খাটতে হবে।'

'তাতে ছেলের উপকারই হবে। আমার ছেলে ওস্তাদ হতে চায়। শুধু যেমন-তেমন নয়, সত্যিকারের ওস্তাদ। ধন্যবাদ আপনাকে। আসি।'

'আসুন।'

পনের নম্বর ট্রলিবাসে চেপে গালাই-কর গেল তকতকে গলিতে। বগলে তার কাগজে মোড়া ছোট্ট একটা জং ধরা লোহার মানুষ।

ছ'তলায় উঠে ২১ নম্বর ফ্ল্যাটের ঘণ্টি টিপলে সে। দরজা খুললে তিমা নামে ছোট্ট একটি ছেলে। আরে হ্যাঁ, সেই তিমা। তোমরা জানতে না বুঝি, তিমার বাবা গালাই-কর?

'বাবা?' বললে তিমা।

'হ্যাঁ রে বেটা। এই নে তোর জন্যে একটা উপহার — লোহার মানুষ। ভালো করে দেখে শুনে ভেবে দ্যাখ কী করা যায় ওটাকে নিয়ে, মেরামত করা যায় কী ভাবে।'

'কেরোসিন দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে ইস্ক্রুপগুলো আঁটতে হবে, রঙ করাও দরকার,' বললে তিমা।

বাপের উপহারটা আরেকবার নজর করে হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল:

'আমি যে একে চিনি! বাবা, এ হল সর্বকর্মা!'

'কীসের সর্বকর্মা?.. ও হ্যাঁ,' মনে পড়ল বাবার, 'আমি ওকে চিনতেই পারি নি। ইস্ক্রুপ টিস্ক্রুপ একেবারে খুলে গেছে। নিশ্চয় বিপদে পড়েছিল কোনো। চটপট মেরামত করা দরকার। বেচারি সর্বকর্মা।'

সর্বকর্মাকে তিমা ভিজিয়ে রাখলে কেরোসিনে, শিরীষ কাগজ দিয়ে এমনভাবে পরিষ্কার করলে যে লোহার মানুষটি ঝকঝক করে উঠল নতুনের মতো। স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে তিমা সবকটি ইস্ক্রুপকে এ'টে দিলে। তারপর পরিষ্কার ন্যাকড়ায় তাকে মুছে নতুন রঙ চাপালে। নতুন পোষাকে ভারি সুন্দর দেখাল সর্বকর্মাকে। কিন্তু নড়াচড়া তার দেখা গেল না।

'কী করা যায় তাহলে?' কাঁধ কোঁচকালে গালাই-কর।

'আমি ঠিক পারছি না,' স্বীকার করলে তিমা, 'শোনো বাবা, আমি কিশোর টেকনিশিয়ানদের প্রাসাদে গিয়ে নামকরা সেই পেনসিলপুত্র প্রভৃতিকে নিয়ে আসব। এত তার নাম, এমন সে ওস্তাদ, নিশ্চয় সারিয়ে দেবে।'

'উ'হু, দাঁড়া,' বললে বাবা, 'সর্বকর্মাকেই ওখানে নিয়ে যাব আমরা। ওস্তাদ ওখানে আরো পাওয়া যাবে। পেনসিলপুত্রের ওপর আমার বড়ো একটা ভরসা নেই।'

অধ্যায় চুয়াল্লিশ

ছুটন্ত গালিচা, কথা-কওয়া দরজা

কিশোর টেকনিশিয়ানদের প্রাসাদটা ছিল মেকানো রাস্তায়। তিমা আর গালাই-কর এসে দাঁড়াল পেল্লাই দরজার কাছে, কোনো হাতল নেই তাতে। দরজা কিন্তু আপনা থেকেই খুলে গেল তাদের সামনে।

এ হল স্বয়ংক্রিয় দরজা। অমায়িকভাবে দরজা বললে: 'স্বাগতম্।'

মেঝের ওপরকার ফুঁয়ো-ফুঁয়ো সুন্দর গালিচাটা মেট্রোর সিঁড়ির মতো ছুটতে লাগল তাদের পায়ের তলে, মানুষের গলায় বললে:

'কোন বিভাগে যাবেন?'

গালিচাটাও স্বয়ংক্রিয়।

'ঠিক জানি না,' বললে গালাই-কর। ফুঁয়ো-ফুঁয়ো গালিচাও অমনি থেমে গেল।

প্রকাণ্ড হল-ঘরটায় ঝুলছে বিখ্যাত প্রুতিয়া পেনসিলপত্রের পোর্ট্রেট। বাঁ দিকে জন কয়েক ছেলে দুর্বোধ্য কী একটা যন্ত্র নিয়ে ঠুকছে, ঘোরাচ্ছে, ফুটো করছে।

'আমরা বানাচ্ছি স্বয়ংক্রিয় পোষাক-বরদার। নিজেই সে অভ্যাগতদের ওভারকোট খুলে নিয়ে টাঙিয়ে রাখবে,' গালাই-কর কাছে আসতেই ছেলেগুলো জানাল তাকে।

গালাই-কর বললে, 'তোমাদের এখানে একটি লোহার মানুষ এনেছি আমরা। নষ্ট হয়ে গেছে, মেরামত করা দরকার। কে করতে পারবে বলো তো?'

'প্রুতিয়া পেনসিলপত্র,' বললে তিমা।

'ঠিকই,' সায় দিলে ছেলেগুলো, 'পেনসিলপত্র খুবই নামকরা ওস্তাদ। ওর চেয়ে ভালো আর কাউকে পাওয়া যাবে না।'

'তাহলে পেনসিলপত্রকে একটু ডেকে দাও-না ভাই,' বললে তিমার বাবা গালাই-কর।

'কী বলছেন আপনি!' বললে ছেলেরা, 'পেনসিলপত্র এখন খুবই ব্যস্ত। অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে। আইসক্রীম কারখানার লোকেরা তার কাছে এসেছে জরুরী কাজে। আইসক্রীম খেয়ে পরীক্ষা করে দেখছে সে। নতুন আইসক্রীম — নাম তার 'প্রুতিক'।'

'নতুন আইসক্রীম চেখে দেখা — খুবই জরুরী কাজ নিশ্চয়,' বললে গালাই-কর, 'তাহলেও অনুরোধ করছি, ডেকে দাও-না ভাই। লোহার মানুষটির বড়োই বিপদ।'

অসাড় সর্বকর্মার দিকে চাইলে ছেলেরা, মাথা নাড়লে, তারপর কী একটা ঝকঝকে বোতাম টিপলে দেয়ালে। তীক্ষ্ন একটা সংকেতধ্বনি শোনা গেল।

ছবি ফুটে উঠল টেলিভিশনে। দেখা গেল সেই ঘরটা, যেখানে বসে বসে আইসক্রীম খাচ্ছে প্রতিয়া পেনসিলপুত্র।

'কে আমায় ডাকছে?' অসন্তোষে জিজ্ঞেস করলে সে।

'তোর সাহায্য দরকার,' বললে ছেলেরা, 'জরুরী সাহায্য।'

'দেখতে পাচ্ছ না? আমি ব্যস্ত।'

'মাপ কর, কিন্তু এতই গুরুতর কাজ যে তোকে ছাড়া চলবে না।'

'তাই যদি হয়,' সগর্বে কিঁচকিঁচ করলে পেনসিলপুত্র, 'তাহলে মিনিটখানেকের জন্যে যাচ্ছি।'

ধীরেসুস্থে ঘরে ঢুকল সে, নামকরা লোকেদের যেভাবে ঢোকা উচিত।

'কী ব্যাপার?'

'লোহার মানুষটিকে সারিয়ে দে ভাই।'

সর্বকর্মার দিকে তাকিয়ে দেখেই সে লুটিয়ে পড়ল তার ওপর। চেঁচিয়ে উঠল: 'সর্বকর্মা! লাফাচ্ছ না কেন? কে তোমার এই দশা করলে?'

'মেরামত করা দরকার। তাহলে ও বলবে কে করেছে,' বললে ছেলেরা।

'আমি — মে-মেরামত করতে জানি না,' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল প্রুতিক, 'আমি কিছুই পারি না। জাহাজটা বানিয়েছি আমি নই, বানিয়েছে ও — সর্বকর্মা। বেচারি সর্বকর্মা!' কান্নায় গাল ভাসিয়ে বললে ছেলেটা।

'সময় নষ্ট করে লাভ নেই,' শান্তভাবে বললে গালাই-কর, 'লোহার মানুষটিকে মেরামত করতে কে পারবে?'

'আমরা!' জবাব দিলে ছেলেরা।

'আমিও চেষ্টা করে দেখি,' বললে তিমা।

'বেশ, যন্ত্রপাতি নাও। আমার মনে হচ্ছে, ইস্ক্রুপগুলো আরেকবার পরখ করা দরকার।'

সাবধানে প্রতিটি ইস্ক্রুপে পাক দিয়ে দেখা হল, যাচাই করা হল প্রতিটি স্প্রীঙ। হঠাৎ চোখ মেললে সর্বকর্মা।

'প্রুতিক? তিমা? তোরা এখানে এলি কোত্থেকে? ডাকাতরা কোথায়? পেনসিল কোথায়?' লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠল সর্বকর্মা, 'ডাকাতরা খুন করবে পেনসিলকে। ওদের যে পিস্তল আছে। জাহাজ দখল করে বসেছে ওরা।'

'কোন ডাকাত? কিসের পিস্তল?' জিজ্ঞেস করলে গালাই-কর।

'জলদস্যু আর গুপ্তচর সিংধেল।'

'বোঝা গেল,' দীর্ঘশ্বাস ফেললে গালাই-কর, 'যত রাজ্যের গুপ্তচর আর জলদস্যুর বই পড়ে বেচারি লোহার মানুষটি মগজ ভর্তি করে ফেলেছে...'

'শীগগির চলো প্রশান্ত উপকূলে। বাঁচাও পেনসিলকে!' ডাকলে সর্বকর্মা।

'আমার বাবা পেনসিলকে বাঁচাও!' কেঁদে ফেললে ছোট্ট প্রুতিক।

'বাঁচিয়ে দাও, বাবা,' বললে তিমা।

অধ্যায় পঁয়তাল্লিশ

ঘটনার সমাপ্তি

জলদস্যুর কালো পতাকা গলুইয়ে উড়িয়ে 'প্রুতিক' জাহাজ দূর যাত্রায় তৈরি হচ্ছে। হাত-পা বাঁধা বন্দীরা বসে আছে ঘিঞ্জি কেবিনে। ডেকে দাঁড়িয়ে আছে দুর্দান্ত এক ক্যাপটেন, পার্টাকিলে তার দাড়ি, রোমশ বুকের ওপর জাহাজী ফতুয়া, কোমরে প্রকাণ্ড পিস্তল।

'তোলো পাল!' হুকুম দিলে ক্যাপটেন টগবগ।

এ হুকুম সে দিয়েছে ছাব্বিশ বার। খালি পায়ে মাস্তুলে মাস্তুলে উঠেছে রেগে-কাঁই খালাসি সিংধেল। হাঁসফাঁস করেছে সে, ফোঁৎফোঁৎ করেছে, গালাগালি দিয়েছে। পাল খাটাচ্ছে সে আড়াই ঘণ্টা ধরে, এখন এই শেষ পালটি বাকি।

তীর বরাবর গোটা রাস্তা ভরে উঠেছে উৎসুক ছেলেপিলেয়। খদ্দেরের অপেক্ষায় ভাসমান দোকানটা দাঁড়িয়ে আছে জেটিতে। কিন্তু কলের জাহাজের জন্যে খদ্দেরদের তখন আর গরজ নেই।

রওনা দিচ্ছে যে পাল-তোলা জাহাজ!

দোকানে বসেছিল নাবিকের মতো দেখতে গুঁপো লোকটা। পাল খাটানো দেখছিল সে, আর কে জানে কী সব কথা বলছিল নিজের মনে:

একেবারে আনাড়ী! এই তোমার নাবিক? আরে ওভাবে নয়! ওভাবে নয়! অমন লট-পটকরা কাঠির ওপর ন্যাতা আর টানিস না।'

তীরের কাছে নতুন বাড়ি তুলছিল যেসব শ্রমিক, তারা সিগারেট খাবার জন্যে ক্রেন থামিয়ে দিলে। জাহাজের জলযাত্রা দেখতে সবারই আগ্রহ।

এবার শেষ পালটিও বাতাসে ফুলে উঠল।

'নোঙর তোলো!' হুকুম দিলে ক্যাপটেন।

কেঁপে উঠে জাহাজ, ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল তীর থেকে।

'থামো! আটকাও ওদের!' শোনা গেল কার একটা গমগমে গলা।

জেটির কাছে এসে দাঁড়াল এক ট্যাক্সি। দরজা খুলে লাফিয়ে নামল তিমা, গালাই-কর, সর্বকর্মা আর প্রুতিক।

'আটকাও ওদের!' বললে গালাই-কর, 'ওরা ডাকাত!'

'শুনছিস, এরা তাহলে ডাকাত!' কলরব করে উঠল ছেলেপিলেরা, 'সত্যিকারের ডাকাত! কী মজা!'

'থামো বলছি!' আদেশ করলে গালাই-কর।

'কোথায় পেনসিল? ফিরিয়ে দাও পেনসিলকে!' চ্যাঁচালে তিমা আর সর্বকর্মা।

ভয়ংকর অবাক হয়ে ডাকাতরা তাকালে সর্বকর্মার দিকে।

'সেটি হচ্ছে না!' সাহস ফলিয়ে বললে সিঁধেল, 'মনের আনন্দে পড়ে থাকো! লবডঙ্কা! আমরা কেটে পড়ছি!'

'মোটর-বোটে স্টার্ট দিন একটু, ওদের ধরতে হবে,' নাবিকের মতো দেখতে গুঁপো লোকটাকে বললে গালাই-কর।

'চেষ্টা করে দেখি। তবে মোটরে আমার গড়বড় আছে। চট করে সারাতে পারব বলে ভরসা হচ্ছে না।'

'আসি গো!' ডেকের ওপর ডাকাতে নাচ নাচতে নাচতে ঠাট্টা করলে ডাকাতরা, 'লবডঙ্কা!'

'কী করি তাহলে?' বললে গালাই-কর, 'সাঁতরে গিয়ে ওদের ধরতে পারব না।' চারিদিকে তাকিয়ে দেখল সে, 'এই কমরেডরা!' হাঁক দিলে সে ক্রেনচালক মজুরদের দিকে, 'ক্রেন দিয়ে তুলে নাও না ভাই জাহাজটাকে।'

ক্রমেই সরে যাচ্ছিল জাহাজটা। কিন্তু ডাকাতদের ভয়ঙ্কর আঁতকে দিয়ে ক্রেনের লম্বা হাতটা চলে গেল জলের ওপর তারপর ওপরকার দড়ি দড়ায় হুক আটকে আলগোছে তুলে নিলে জাহাজটা।

'বাঁচাও! বাঁচাও!' চেঁচাতে লাগল তারা, 'লুঠ করলে!'

ডেকের ওপর লাফালাফি ছুটোছুটি লাগালে তারা। জাহাজটাও টলমল করে উঠল, ডাকাতরাও কেলে-ছোপের সঙ্গে উলটে পড়ল নদীর জলে।

'ডুবে মলুম! বাঁচাও!' আওয়াজ ছাড়লে সিঁধেল।

'টগ্-বগ্-বগ্!' হাবুডুবু খেতে খেতে বুদ্বুদ ছাড়লে ক্যাপটেন টগবগ।

অমন জলদস্যু, নামকরা বোম্বেটে, দেখা গেল সাঁতরাতে জানে না।

'ডেক থেকে লোক পড়ে গেছে,' বললে নাবিকের মতো দেখতে গুঁপো লোকটা। ডুবন্তদের বাঁচাবার জন্যে মুহূর্তে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে।

জাহাজটাকে নামানো হল তীরে। হাতে পায়ে ভর দিয়ে ডেকে উঠল সর্বকর্মা। যে কেবিনে বন্দীরা ছিল তার তালা খুলে দিলে গালাই-কর।

কেবিনে ঢুকে পড়ল সর্বকর্মা। ঢুকল তো ঢুকলই, অনেকক্ষণ তাকে আর দেখা গেল না।

কখন কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছে ভোনিয়া কাশকিন। ভিজে জবজবে কাহিল দুই ডাকাতকে নিয়ে আসা হল তীরে, নাবিকের মতো দেখতে গুঁপো মানুষটা তাদের ঘাড় ধরে ঝোলাচ্ছে যেন দুই কুকুর-ছানা।

এসে গেল মোটর সাইকেলে পাহারাওয়ালা।

'এরাই সেই ডাকাত?!' জিজ্ঞেস করলে সে।

'এরাই!'

'বটে!'

'হঠাৎ হয়ে গেছে!' চেঁচাল ডাকাতেরা, 'আর কখখনো করব না!'

হেসে উঠল সবাই।

'কিন্তু কী করবে না?' জিজ্ঞেস করলে পাহাড়াওয়ালা।

'ডাকাতি করব না।'

'বেশ, তাহলে কী করবে?'

'কিছুই না!' কসম খেলে ডাকাতরা।

'সেটি হচ্ছে না। "কিছুই না" আমাদের এখানে চলে না। কাজ করতে হবে, হে ডাকাতেরা। কাজ!'

'কাজ করতে যে আমরা জানি না।'

'এমন লোক জীবনে এই প্রথম দেখছি! কাজ না করে বসে থাকতে একঘেয়ে লাগে না?' অবাক হল পাহাড়াওয়ালা, 'কিন্তু কিছুই কি করতে পারো না তোমরা?'

'আমি হুকুম করতে পারি! বাঁয়ে হাল! ডাইনে হাল!' বড়াই করলে জলদস্যু।

'আমি পারি তক্কে তক্কে থাকতে, পেছু ধরতে, নজর রাখতে,' বললে সিঁধেল।

'কোনোটাই চলবে না। পেছু ধরা, নজর রাখার কোনো দরকার নেই আমাদের।'

'ছি-ছি-ছি!' বললে সবাই, 'স্রেফ অবিশ্বাস্য ব্যাপার। দ্যাখো-না এই লোকদুটোকে। কিছুই নাকি ওরা পারে না।'

‘এ লোকটা তক্কে তক্কে থাকতে পারে বলছে, না?’ গুপ্তচরকে দেখিয়ে বললে একজন লোক, ‘ঠিক এইটেই আমার দরকার। আমি হলাম শহরের উদ্যান-পাল। বাগান, বুলভার, পার্কগুলোয় ও আমার কাজ করবে। গাছ-খেকো কীট, শুঁয়োপোকা — এই সব অনিষ্টকর জীবের পেছু নিয়ে সে তাদের ধরবে।’

‘ঘেউ-ঘেউ!’ চ্যাঁচালো ভেজা কুকুর কেলে-ছোপ। ও বলতে চাইছিল: ‘আমিও পোকা মাকড় খুঁজে বার করতে পারি।’

‘গাছ-খেকো পোকা খোঁজাটা খুবই উপকারী কাজ।’ বাহবা দিলে নাবিকের মতো দেখতে গুঁপো লোকটা। সেই সঙ্গে যোগ দিলে, ‘আর এই ভেজা-জবজবে অকম্মা ক্যাপটেনটিকে আমি নেব আমাদের দোকানে। আমার একজন সহকারী দরকার। ছাঁকনি দিয়ে কলের জাহাজ ছেঁকে তুলবে জল থেকে। পাল-তোলা জাহাজটায় খুলব আমাদের দোকানের একটা শাখা।’

‘হুররে!’ চেঁচিয়ে উঠল সমস্ত ছেলেপিলে, ‘হুররে!’

ক্যাপটেন টগবগ ভাসমান দোকানের কর্মচারী হয়ে গেল বলে হুররে দেয় নি তারা।

জাহাজের কেবিন থেকে তখন অবশেষে বেরিয়ে আসছিল দুই বন্ধু। আনন্দে হাসছিল সর্বকর্মা।

ফুর্তিবাজ পটুয়া হেসে হাত নাড়াচ্ছিল সমস্ত ছেলেদের উদ্দেশে। আর ছেলেরা, তিমা আর প্রুতিক ইতিমধ্যেই সব ঘটনাটা বলে দিয়েছিল তাদের, ধ্বনি দিলে:

‘নির্ভীক সর্বকর্মা জিন্দাবাদ!’

‘দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো যাদুকর পটুয়া পেনসিল জিন্দাবাদ!’

হুররে! হুররে! হুররে!

তিমাকে কোলে তুলে নিলে গালাই-কর, সব যাতে সে দেখতে পায়!

‘হুররে!’ বললে তিমা, ‘ফতে! হুররে!’

অধ্যায় ছেচল্লিশ

গল্পের শেষ

দিন কয়েক পরে শহরের সবচেয়ে সুন্দর চক ঝলমলে চকে দেখা গেল প্রকাণ্ড এক পোস্টার, যে কেউ তা পড়তে পারে:

ছেলেপিলেরা!

যাদুকরী ছবি
আঁকা শিখতে চাও কেউ?
তাহলে পেনসিল আর সর্বকর্মার
নতুন ইশকুলে ভর্তি হও!

ইশকুলটা খুলেছে রোমাণ্টিক চকের
স্বপ্নিল রাস্তায় ২১ নম্বর বাড়িতে।
এখানে সব রকমের যাদুকরী
ছবি আঁকা শেখানো হবে।
ছবিতে যে বাড়িটা আঁকবে
সেটা মাথা তুলবে সবচেয়ে সুন্দর সুন্দর সবুজ রাস্তায়।
হাসিখুশি দিলদরাজ সব
লোক বাস করবে সে সব বাড়িতে।
তোমাদের আঁকা মোটরগাড়িতে চেপে ঘুরে বেড়াবে তারা,
পরবে তারা তোমাদের আঁকা পোষাক,
যাবে তোমাদের আঁকা থিয়েটারে।
শহর, গাড়ি, কারখানা, ইশকুল, রাস্তা, এরোপ্লেন —
লাখ লাখ হরেক রকম উপকারী জিনিস
তোমরাই ভেবে বার করবে, আঁকবে।
তোমরাই আগে রকেট এঁকে নেবে,
সে রকেট তোমাদের নিয়ে যাবে চাঁদে।
যে চাও, যাদুকরী ছবি আঁকা শিখে নাও,

নতুন ইশকুলে ভর্তি হও!

তোমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে:
যাদুকর পটুয়া, আঁকার মাস্টার
পেনসিল।
এবং প্রধান বৈজ্ঞানিক, উপদেষ্টা-ইঞ্জিনিয়র ওস্তাদ
সর্বকর্মা।

আর ছেলেরা যতক্ষণ সে ইশকুলে ভর্তি হচ্ছে, তার মধ্যে মস্তো এক সফরে বেরবে পেন্সিল আর সর্বকর্মা। ঠিক করেছে তারা সব কিছু দেখবে নিজের চোখে, সব কিছু জানবে, যাচাই করবে, নতুন ইশকুলে তাতে ছেলেদের শেখাতে পারবে ঠিক-ঠাক, ভালোভাবে।

ছবির খোকন প্রতিক ভর্তি হয়েছে নতুন ইশকুলের প্রস্তুতি ক্লাসে।

এইখানেই আমাদের ছোট্ট যাদুকর পটুয়া আর নির্ভীক লোহার মানুষটির গল্পের শেষ। একেবারে সাধারণ লোহার মানুষ হলেও কিন্তু অনেক কিছুই সে করতে পারত, সত্যিকারের যাদুকরের চেয়ে সে কম যায় না। তবে গোপনে তোমাদের একটা কথা বলে রাখি। যাদুকররা বলে: যে নিজে নিজেই সব কিছু করে সে নিশ্চয় হয়ে উঠবে যাদুকর!

আসি তাহলে আমাদের ছোট্ট পাঠকেরা, ছোট্ট শ্রোতারা, ছোট্ট বন্ধুরা!

আসি!

প্রকাশকের নিবেদন

আদরের খোকা খুকু!

'পেন্সিল আর সর্বকর্মার অ্যাডভেঞ্চার' নামে মজাদার আজব কাহিনীর বইটি বাঙলা ভাষায় 'প্রগতি প্রকাশন' থেকে প্রকাশিত 'রামধনু' সিরিজের অন্তর্গত।

এ সিরিজে আগেই বেরিয়েছে:

'বৃষ্টি আর নক্ষত্র' — সোভিয়েত দেশের নানা জাতির লেখকদের গল্প সংকলন। ছবিগুলি মস্কোর একটি ইশকুল-ছাত্রীর আঁকা।

'স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নিশিখা' — ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের কাহিনী। অসংখ্য ফটোগ্রাফ।

'যাদু তীর' — লেখিকা ল্যুবোভ ভরোণ্কভা; 'যাদু তীর' কাহিনীটি ছাড়াও এতে আছে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়কার একটি ছোট্ট মেয়ের ভাগ্য নিয়ে বড়ো গল্প 'শহরের মেয়ে'।

'ভয়ংকর রোমহর্ষক ঘটনা' — আনাতোলি আলেক্সিনের লেখা; প্রচুর অ্যাডভেঞ্চার সমেত মজার একটি মন-কাড়া বই।

'পৃথিবী দেখছি' — বিশ্বের প্রথম ব্যোমনাবিক, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর, ইউরি গাগারিন তাঁর মহাকাশ যাত্রার কাহিনী শুনিয়েছেন। বলেছেন, কেমন তাঁর জীবন, কেমন শিক্ষাদীক্ষা, গাঁয়ের একটি সাধারণ ছেলে কেমন করে হয়ে উঠল মহাকাশজয়ী। অনেক প্রামাণ্য ফোটোগ্রাফ আছে বইটিতে।

বইগুলি তোমাদের আর তোমাদের গুরুজনদের কেমন লাগল, কী তোমাদের ইচ্ছে, তা জানতে পেলে প্রকাশালয় খুশি হবে।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union